চিত্তরঞ্জন

শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ গুপ্ত

ইণ্ডিয়ান বুক ক্লাব
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট
১৩২৫

প্রকাশক—
শ্রীকীর্ত্তিচন্দ্র রায় চৌধুরী এম-এ
ইণ্ডিয়ান বুক ক্লাব
কলেজষ্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা।

মূল্য বার আনা মাত্র

কাত্যায়নী প্রেসে
শ্রীযোগজীবন ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত
১৮।১নং ফকিরচাঁদ মিত্রের ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

উৎসর্গ পত্র



বন্ধুবর শ্রীহেমন্তকুমার সরকার

অভিন্নহৃদয়েষু

হেমন্ত—

তোমার অনুরোধে আমার বংশের এই ত্যাগী কর্ম্মবীরের জীবনী লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম এবং তোমারই উৎসাহে এখন ইহা শেষ করিয়াছি। তোমার হাতে ইহা সমর্পণ করিয়া ধন্য হইলাম।

কসবা রোড
বালিগঞ্জ

তোমার স্নেহের
সুকুমার



ভারতরঞ্জন চিত্তরঞ্জন

মুখবন্ধ

—:০:—

ভগবান্ যখন মানুষের মনে একটা নূতন প্রেরণা আনিয়া দেন, তখন সে আপনাহারা হইয়া সেই প্রেরণার দিকেই ছুটিতে চায়। সাধারণ সংসারী মানুষে তাহাকে তখন আখ্যা দেয় "পাগল।" কিন্তু যাহার মনে সেই নূতন ভাব-গঙ্গার বাণ ডাকিয়াছে, সে যে পারিপার্শ্বিক কোনও অবস্থার দিকে তাকাইবার ও সময় পায় না; কে হাসিল বা কে বিদ্রূপ করিল একথা ভাবিবার তার অবস্থা তখন নাই। সে তখন এক প্রাণ-মাতান উত্তাল সঙ্গীতের সুরে আপনার হৃদয়-বীণাকে বাঁধিয়া ধরে, তাহাতে কোন্ লীলাময়ের পরশে কত ঝঙ্কার ধ্বনিত হইয়া উঠে। এই প্রেরণাই কখন জ্ঞানের প্রেরণা কখন প্রতিভার প্রেরণা, কখন ত্যাগের প্রেরণা কখন দেশ-জননীর চরণে আত্মোৎসর্গের প্রেরণা। মৃগের যখন বয়ঃসন্ধিক্ষণে নাভিদেশে প্রথম কস্তুরীর উদ্ভব হয়, তখন সে এক নূতন আবেশে অধীর হইয়া বন হইতে বনান্তরে অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়, কাহাকে সে জানে না; কিন্তু এমনি উন্মাদের মত ছুটিয়া বেড়ান ছাড়া যে তার গতি নাই—শক্তি নাই; কখন বৃক্ষের শাখায় তাহার শৃঙ্গ আঘাত পাইতেছে, কখন কণ্টকে তার পদদেশ ছিন্ন হইতেছে, ইহাতে তাহার ভ্রূক্ষেপও কিন্তু নাই। মানুষের মনেও যখন

ভাবের জোয়ার আসে তখনও ঠিক তার অবস্থা এমনই হয়। খেয়াল নাই, চিন্তা নাই, কাহার সন্ধানে সে ছুটিয়াছে, অনেক সময় সেই হয়ত জানে না।

সাধারণ লোকে কিন্তু তখন বলে তাহার মস্তিষ্কের বিকার জন্মিয়াছে, পাগলামির ছিট দেখা দিয়াছে। কিন্তু এ ছিট কাহারও কাহারও মনে না জাগিলে একটা জাতিই বা তার স্বাতন্ত্র্য তার বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিবে কি করিয়া! একটানা গড্ডলিকা প্রবাহের সঙ্গে চলিয়াই ত সাধারণ লোকে জন্মগ্রহণ করে, আহার নিদ্রা বিলাস লইয়া জীবন অতিবাহিত করে তারপর একদিন অন্তিম নিঃশ্বাস ফেলিয়া অনন্ত সাগরে জলবুদ্‌বুদের মত কোথায় বিলীন হয় কে জানে! কিন্তু সে জাতীয়তার ধারা অক্ষুণ্ণ রাখে ঐ রকম যাদের পাগলামির ছিট আছে। এমনি একদিন ভাব-সাগরের তরঙ্গের তালে ভাসিয়া উঠিয়াছিল প্রেমভিখারী গৌরচন্দ্র. যাঁহার আচণ্ডালকে কোল দেওয়া প্রেমের নদীতে স্নান করিয়া বাঙ্গালা নষ্ট বৈশিষ্ট্য উদ্ধার করিয়া নিয়াছিল। আবার সে দিন হিংসা দ্বেষ ও ধর্ম্মের নামে রেশারেশিতে যখন বাঙ্গালা দেশ মরিতে বসিয়াছিল, তখন এমনি ছিট নিয়াই স্বামী বিবেকানন্দ সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের মহামন্ত্র ছড়াইয়া এই বাঙ্গালার মরা গাঙ্গে প্রাণের জোয়ার আনিয়া দিয়াছিলেন। তারপরে আজ বাঙ্গালার ভদ্র ইতর সব সন্তান বিলাসের মোহে পড়িয়া আলস্য সৌখিনতার ঘুর্ণাবর্ত্তে চুবানি খাইয়া আর পরপদলেহনে ও পরানুকরণে ব্যাপৃত হইয়া অতীত বাঙ্গালার আদর্শ ভুলিতে বসিয়াছে, তাই সাধনার

দীপ নিবিয়া যাইতেছে। আজ তাই বাঙ্গালী না খাইতে পাইয়া মরিতে বসিয়াছে, আবার তাহার লুপ্ত আদর্শ ফুটাইয়া তুলিবার শক্তি কাহার হইবে কে জানে। কিন্তু আজ যিনি সংসারী সাধারণের কাছে পাগল আখ্যা পাইয়া বাতিকগ্রস্ত বলিয়া পরিচিত হইয়া বিলাস ও সুখ ভোগ ছাড়িয়া দেশের জন্য দশের জন্য ভিক্ষার ঝুলি হাতে লইয়াছেন এবং যাঁহার নেতৃত্বে ত্যাগের পথে চলিয়া দেশ জননীর সেবা করিবার জন্য আমাদিগকে আহ্বান করিতেছেন, তাঁহার জীবনের পরিচয় এ যুগ-সন্ধিক্ষণে আমাদিগের মনে ত্যাগের নিষ্ঠা জাগাইয়া দিবে। তাঁহার এই পাগলামির ছিট দেশের ভবিষ্যৎ আশাস্থল যুবকবৃন্দের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িলেই আশা হয় তাহারা আপনাদিগের আদর্শ বুঝিবে, নিজের নিজের আত্মসম্মান ও আত্মনির্ভর ভাব ফিরিয়া পাইবে এবং বোধ হয় তাহাতে বাঙ্গালার শ্মশান আবার প্রকৃত মনুষ্যের আবাস হইয়া উঠিবে। কারণ ভগবান্ যেন সত্যই আমাদিগের প্রাণের প্রাণে বলিয়া দিতেছেন "নান্যঃপন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।"

প্রথম অধ্যায়

বংশ-পরিচয়, বাল্যজীবন ও শিক্ষাবস্থা

গঙ্গা-পদ্মা-মেঘনা-বিধৌত প্রাচীন গৌড় বঙ্গের অতীত জ্ঞান সমৃদ্ধির স্বপ্নময় নিবাস পূর্ব্ব বাঙ্গালার অন্তর্গত প্রসিদ্ধ বিক্রমপুর পরগনা। কত প্রাচীন এই স্থান! কত সভ্যতার কাহিনী এই ধূলিতে তাহার চরণচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। কত দানসাগর এই পদ্মানদীর তটে তরঙ্গের উপর দিয়া মাণিক ছড়াইয়া দিয়াছে সে স্মৃতি আজ ধ্যানের সামগ্রী। কিন্তু স্মৃতি আত্মস্থ হইতে শিখায়, প্রতি ব্যষ্টিতে চৈতন্যের আভাস জাগাইয়া দেয়, তাই স্মৃতির ধ্যান পুণ্যকথা। এই বিক্রমপুরের প্রতি গৃহাঙ্গনে কত ইতিহাস জড়িত আছে। কত আলোকোজ্জ্বল প্রভাত, কত অমানিশার রজনী তাহার অঙ্গে অঙ্গে মিশিয়া আছে। দুর্দ্দাম দুর্ব্বার পদ্মার ভাঙ্গন, কত রাজ্য সে গড়িয়াছে আর ভাঙ্গিয়াছে। কত বড় ইতিহাস সে রচিয়াছে আবার নিজেই মুছিয়া ফেলিয়াছে।

পুরাতনের স্বপ্ন ঘেরা মোহতমসাচ্ছন্ন দিনের পরপারে অতীতের যবনিকা সরাইয়া একবার পূর্ব্ব গৌরব স্মরণ করিয়া লই। এই সেই পদ্মা মেখলা চিরশ্যামা তটভূমি যাহা একদিন মহিমার কোটি সূর্য্যকিরণভাতিতে দীপ্তিময়ী ছিল। বিক্রমপুর বলিতে সেই

পুরাতন গৌড়বঙ্গের কেন্দ্র বলিয়া মনে হয়। সেই যুগেই গৌড়-বঙ্গের শিল্প প্রতিভায় বাঙ্গালার প্রাণধর্ম্মের বিকাশ অতি সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল; সে কাহিনী সোনার নিকষরেখা ইতিহাসে টানিয়া রাখিয়াছে। তারপর যে দিন সেই জ্ঞানের মহামণি যাহা সে অতি যত্নে প্রাণের মণিকোঠার ধরিয়া রাখিয়াছিল, তাহা টুকরা টুকরা হইয়া গেল, যে দিন গৌড়ের স্বাধীনতার রত্ন গঙ্গার জলে ভাসিয়া গেল, সেই দিনেও এই পদ্মাবেষ্টিত শ্রী বিক্রমপুরের প্রাসাদশীর্ষে স্বাধীনতাসূর্য্যের শেষ রশ্মিরেখা বঙ্গের ভাগ্যকাশ হইতে একেবারে মিলাইয়া যায় নাই। আজ বিক্রমপুরের সে শ্রী নাই, বুকের উপর দিয়া পদ্মা চলিয়া গিয়াছে, সে ভূভাগকেও টুকরা করিয়া দিয়াছে।

এ সেই বিক্রমপুর যাহার মহাবীর্য্যের কেন্দ্র হইতে গৌড়বঙ্গ একদিন প্রয়াগ পর্য্যন্ত শাসনদণ্ড পরিচালন করিত, যে কেন্দ্র হইতে বঙ্গ জগতের বিলাস যোগাইত, যে কেন্দ্র হইতে গৌড়ীয় রীতি ভারতে প্রচারিত হইয়াছিল। এ সেই ভূমি যে ভূমিতে আদিশূর একদিন পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিয়াছিলেন, এ সে ভূমি যেখানে সাগ্নিক পঞ্চ ব্রাহ্মণ আসিয়া আশীষ মন্ত্র ও শান্তিবারিতে শুষ্ক গজারী বৃক্ষ নব মঞ্জরীতে মুঞ্জরিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। এ সেই পদ্মা যাহার উপর দিয়া বাণিজ্যসম্ভার বোঝাই করা অর্ণ-বপোত সিংহল, বালী, আরব, সুমাত্রা হইতে ধন আহরণ করিয়া আনিত, সে ধনেশ্বরী আজ নাই। তাই আজ মুষ্টিমেয় অন্নের জন্য নিজগৃহে পরান্নভোজী, নিজ গ্রামে চিরপ্রবাসী জীবন মরণের

সন্ধিক্ষণে না বাঁচা না মরা করিয়া বিক্রমপুরবাসীরা বাঁচিয়া আছে।

এই অতীত গৌরবময় বিক্রমপুর যাহার অঙ্গে অঙ্গে মিশাইয়া আছে হরিশচন্দ্রের কথা, অতুনা পতুনার সেই প্রাণমনোবিমোহনকারী মধুর কাহিনী, আর সেই চাঁদ রায় কেদার রায়ের বীর্য্যগাথা। এই স্থানে একদিন জ্ঞান ও ধর্ম্মের কত উন্নতি হইয়াছিল, সমতটেব ব্রাহ্মণ রাজ বংশে যে অদ্বিতীয় পণ্ডিত শীলভদ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনিই চীন পরিব্রাজক ইউয়ান চোয়াং এর গুরু। ভারতেতর দেশের পরিব্রাজকেরা জ্ঞানলাভের জন্য এই স্থানে আসিতেন। সেই জগদ্বিখ্যাত দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান এইখানেই জন্মিয়াছিলেন। আজিও লোকে নাস্তিক পণ্ডিতেব বাড়ী বলিয়া দেখাইয়া দেয়। এই গৌড়বঙ্গের বীরদেবই এক দিন জগদ্বিখ্যাত নালন্দা মহাবিহারের প্রধান আচার্য্য ও সংঘস্থবির ছিলেন। তারপর উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ও শেষভাগে ব্রাহ্মসংস্কার ও স্বদেশীর মহা আন্দোলনের দিনে এই পূর্ব্ববাঙ্গালা কত ভাবে কত দিক দিয়া তাহার শক্তি মাতৃপুজায় নিয়োজিত করিয়াছিল।

এই বিক্রমপুরের অন্তর্গত তেলিরবাগ গ্রামে চিত্তরঞ্জনের পৈতৃক বসবাস। পূর্ব্ববঙ্গে প্রসিদ্ধ যদুনন্দন বৈদ্যবংশে তাঁহার জন্ম হয়। বিক্রমপুরের দানশীল অতিথি পরায়ণ বিখ্যাত রতনকৃষ্ণ দাশ মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র জগবন্ধু দাশ চিত্তরঞ্জনের পিতামহ। জগবন্ধু মোক্তারি করিয়া বেশ দুপয়সা উপার্জ্জন করিতেন। কিন্তু এই বংশের দোষ কি গুণ বলিতে পারি না সঞ্চয়ের দিকে কাহারও

বড় দৃষ্টি দেখা যায় না। জগদ্বন্ধুর ক্ষেত্রে ও এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে নাই। তাঁহার উপার্জ্জনের অধিকাংশই দুঃস্থ আত্মীয় স্বজনের ভরণপোষণে এবং স্বগ্রামের অতিথিশালায় ব্যয়িত হইত। তাঁহাদের প্রদত্ত অর্থে যথাযথ অতিথিসেবা হয় কিনা ইহা পরীক্ষা করা ও তাঁহার এক কাজ ছিল। কথিত আছে একদিন মধ্য-রাত্রে তিনি নৌকা করিয়া ছদ্মবেশে গ্রামের ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং লোকদিয়া অতিথিশালায় সংবাদ পাঠাইলেন যে একজন ক্ষুধার্ত্ত অতিথি উপস্থিত। অত রাত্রে অতিথিশালার কর্ম্মচারিরা কেহই উঠিয়া অতিথির অভ্যর্থনা করিতে চাহিল না, বিরক্ত হইয়া লোকটিকে ফিরাইয়া দিল। তখন জগদ্বন্ধু অতি মাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া নিজবেশে গৃহে আসিয়া কর্ম্মচারিগণকে অতিশয় তিরস্কার করিয়া ভবিষ্যতের জন্য সাবধান করিয়া দিলেন। অতিথি সেবায় তাঁহার এইরূপ যত্ন ও উৎসাহ ছিল। জগদ্বন্ধু বড় করুণ হৃদয় ছিলেন। তাঁহার বৃদ্ধবয়সে তিনি একদিন পাল্কী চড়িয়া একটি গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাইতেছিলেন, পথে দেখিলেন একজন ব্রাহ্মণ অতিশয় ক্লান্তভাবে পথ হাটিয়া যাইতেছেন। তিনি তখনই ব্রাহ্মণকে ডাকিয়া বলিলেন, ঠাকুর আপনি এই পাল্কীতে উঠিয়া আপনার গন্তব্য স্থানে যান। এই বলিয়া তিনি ব্রাহ্মণকে পাল্কীতে চড়াইয়া নিজে অনেকটা দূর পথ পায়ে হাটিয়া চলিয়া আসিলেন। এতদ্ব্যতীত জগদ্বন্ধু বিশেষ বিদ্যোৎসাহী ও সুকবি ছিলেন। বাঙ্গালা কবিতায় তাঁহার বেশ নৈপুণ্য ছিল। তদ্‌রচিত নারায়ণসেবা ও হরির লুটের পুঁথি এখনও

বিক্রমপুরের সকল গৃহেই আদরের সহিত পূজার সময় পঠিত হইয়া থাকে। উহা যেমন সরল ভাষায় লিখিত তেমনই সুন্দর শ্রুতিমধুর ছন্দ বদ্ধ। উহার ভাব ও রচনা সত্যই এমনই চমৎকারপ্রদ যে ইহার পঠন সময়ে বাড়ীর আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই খুব আগ্রহের সহিত প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করিয়া থাকে উহার আখ্যায়িকাগুলি ও বেশ মর্ম্মস্পর্শী ও হৃদয়গ্রাহী। মোটের উপর পিতামহের এই অতিথি পরায়ণতা দানশীলতা ও কাব্যশক্তি পৌত্র চিত্তরঞ্জনের মধ্যে বিশেষ ভাবেই আশ্রয় লইয়াছে।

চিত্তরঞ্জনের পিতা ভুবনমোহন দাশ মহাশয় জগদ্বন্ধুর একমাত্র পুত্র ছিলেন। ভুবনমোহন কলিকাতা হাইকোর্টের বিখ্যাত এটর্নি ছিলেন। তাঁহার জীবনের কিয়দংশ সংবাদপত্রের সম্পাদকতায় নিযুক্ত ছিল। প্রথমে তিনি ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র Brahmo public opinion নামক সংবাদপত্রের সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার সম্পাদন কালে এই পত্রের বিশেষ প্রতিপত্তি ও প্রসিদ্ধি লাভ হইয়াছিল। পরে তিনি Bengal public opinion নামক পাক্ষিক সংবাদপত্রের সম্পাদক নিযুক্ত হন। সেই সময়কার বাঙ্গালী সম্পাদকমণ্ডলীর মধ্যে তিনি সম্পাদনকার্য্যে বিশেষ উচ্চস্থান ও খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার ইংরাজি ভাষা জ্ঞানও বিশেষ প্রশংসাযোগ্য ছিল। তাঁহার লিখনভঙ্গী এমন সতেজ ও বিষয়ানুরূপ ছিল যে সেই সময়কার অন্য ইংরাজী সংবাদপত্রে প্রায় তেমন ভঙ্গী দেখা যাইত না। তাঁহার সম্পাদক

জীবনে তিনি নির্ভীকতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছিলেন। একবার তিনি Bengal public opinionএ কলিকাতা হাইকোর্টের এক বিচারপতির বিচারের ত্রুটি উল্লেখ করিয়া তীব্র সমালোচনা করেন। ইহার কিছুকাল পরেই সেই বিচারপতির নিকট ভুবনমোহন এক প্রাণ দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত আসামীর পক্ষে আপিল করেন। বিচারক তখন তাঁহার আপিলে তেমন মন না দিয়া উদাসীনতার ভাব প্রকাশ করেন। কর্ত্তব্যপরায়ণ ভুবনমোহন তখন বলিয়াছিলেন "আমার প্রতি ধর্ম্মাধিকরণের যদি কোনও বিরক্তিভাব থাকে, সেই জন্য প্রাণ দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত একজন আসামী ন্যায় বিচার হইতে বঞ্চিত না হয় ইহাই আমি আশা করি।" তাঁহার এই তেজোগর্ভ স্পষ্ট কথায় বিচারক সন্তুষ্ট হইয়া সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিয়া আসামীকে অব্যাহতি দান করেন।

তিনি একজন প্রকৃত স্বদেশ সেবক ছিলেন। তাঁহার প্রতি কার্য্যে ও রচনায় স্বদেশপ্রাণতার পরিচয় পাওয়া যাইত। সে যুগের ইংরাজি শিক্ষিত অনেক যুবকই হিন্দুধর্ম্মের পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া ছিলেন। ভুবনমোহন ও তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত পুত্র প্রসিদ্ধ কর্ম্মী ও ধর্ম্ম সংস্কারক দুর্গামোহন দাশ মহাশয়ের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন। প্রকৃত পক্ষে তিনি হিন্দুধর্ম্মের অদ্বৈতবাদের পক্ষপাতী হইয়াই উপনিষদের ব্রহ্মো-পাসনার আশ্রয় লইয়াছিলেন, বস্তুতঃ তাঁহার মধ্যে খ্রীষ্টীয় ভাবের কোনরূপ হিন্দুবিদ্বেষ বা উচ্ছৃঙ্খলতা ছিল না। সত্যই তিনি

প্রাচীনপন্থী হিন্দুদিগের মত সব বিষয়েই উদার ছিলেন। তাঁহার সাংসারিক জীবনে দরিদ্র আত্মীয় বা বন্ধু বান্ধবদিগের সহিত ব্যবহারে তাঁহার স্নেহপ্রবণ সরল অন্তঃকরণের পরিচয় পাওয়া যাইত। তাহাদিগের গৃহে প্রায়ই যাতায়াত ও মেলা-মিশিতে তাঁহার নিরহঙ্কারতা প্রকাশ পাইত। এইরূপ সহৃদয়তা ও এতটা নিরহঙ্কারতা এমন কি চিত্তরঞ্জনের মধ্যেও বিকাশ পায় নাই। কারণ ভূবনমোহনের অমায়িকতা একটা দেবদুর্ল্লভ সামগ্রী ছিল। যাহারা একবার তাহার নিদর্শন পাইয়াছিল, জীবনে তাহারা উহা ভুলিতে পারে নাই। দুঃস্থ আত্মীয় স্বজন বা বন্ধুবান্ধবদের সাহায্যের জন্য তিনি একেবারে মুক্তহস্ত ছিলেন। ভুবনমোহনের এই সরলতা ও সহৃদয়তাই সর্ব্বনাশের মূল হইয়াছিল। এটর্ণি হইয়া তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, কিন্তু সঞ্চয় ত দূরের কথা শেষ জীবনে তাঁহাকে ইন্‌সল্‌ভেন্সি গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। বিলাস তাঁহার একেবারেই ছিল না, অনর্থক ব্যয়ও তিনি করিতেন না। তথাপি যে তাঁহার এইরূপ দশা হইয়াছিল, সে কেবল এই সংসারের দোষ। আমাদিগের দৈনিক জীবনে এমন অনেক লোকের সহিত সাক্ষাৎ হয় যাহারা পরের সহিত প্রবঞ্চনা করিয়া ঠকাইয়া কিছু সংগ্রহ করিতে পারিলে আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করেন। ভুবনমোহনের বন্ধুবান্ধবদিগের মধ্যে এমন লোকের অভাব ছিল না। একে ত তাঁহার দান অপর্য্যাপ্ত ছিল, তাহার উপর তিনি ঋণ দিয়া কখনও তাগাদা দিতে পারিতেন না, সুতরাং সে ঋণ কখনও পরিশোধিত

হইত না। আবার তিনি অল্প পরিচিত দরিদ্র লোকেরা ধরিয়া পড়িলে তাহাদিগের কর্ম্মের সুবিধা করিয়া দিবার জন্য নিজে জামিন হইতেন। তাহারা ভুবনমোহনের এই উপকারের প্রতিদান স্বরূপই যেন কার্য্যস্থল হইতে বিশেষ কিছু অপহরণ করিয়া পলায়ন করিত, আর সমস্ত ভার ভুবনমোহনের স্কন্ধে আসিয়া পড়িত। তাঁহার জীবনে উপকারের পরিবর্ত্তে এইরূপ কৃতঘ্নতা অনেকবারই লাভ করিতে হইয়াছিল, ফলে তিনি সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত পুত্র দুর্গামোহন নিজের যথাসাধ্য দিয়া ভ্রাতাকে কয়েকবার ঋণমুক্ত করিয়াছিলেন বটে। কিন্তু তাহাতেও ভুবনমোহনের সব ঋণ শোধ হইল না, তিনি বাধ্য হইয়া ইন্‌সল্‌ভেন্সি কোর্টের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এই অসম্ভাবিত দশা বিপর্য্যয়ই বোধ হয় তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। যাহা হউক পিতার এই দানশীলতা ও সহৃদয়তা এবং পিতৃব্য দুর্গামোহনের নিঃস্বার্থ পরোপকার স্পৃহা ও সর্ব্বার্থত্যাগের দৃষ্টান্ত পরবর্ত্তী কালে চিত্তরঞ্জনের চরিত্রগঠনে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল।

১২৭৭ সালের ২০শে কার্ত্তিক কলিকাতার পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীটে ভুবনমোহনের বাসাবাটীতে চিত্তরঞ্জন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মের কয়েক বৎসর পর ভুবনবাবু ভবানীপুরে আসিয়া বাসা করেন। সেখানেই চিত্তরঞ্জনের শিক্ষা আরম্ভ হয়। ভবানীপুর লণ্ডন মিশনারী সোসাইটির স্কুল হইতে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন। তৎপরে কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে তিনি

প্রবেশ লাভ করেন! সেখান হইতে তিনি ১৮৯০ সালে বি-এ পাশ করেন! বি এ পরীক্ষায় অল্পের জন্য অনার্স না পাইয়া তিনি প্রথম প্রথম বড়ই নিরাশ হইয়াছিলেন। যাহা হউক তিনি শীঘ্রই বিলাত যাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। বাল্য-কাল হইতেই চিত্তরঞ্জন গণিতে কখনও ব্যুৎপন্ন ছিলেন না, ইহাতে তাঁহার মনোনিবেশ হইত না। সুতরাং সাহিত্যে তাঁহার যথেষ্ট জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা গুলি বিশেষ সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। পাঠ্যাবস্থায়ই কিন্তু তাঁহার বিশিষ্ট সাহিত্যিক প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। প্রেসিডেন্সি কলেজের সাহিত্যসভার তিনি প্রধান কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে একজন ছিলেন। সেখানে তাঁহার বক্তৃতা দেওয়ার শক্তি স্ফূর্ত্তি পাইয়াছিল এবং তাঁহার সমপাঠীরা আশা করিয়াছিলেন তিনি ভবিষ্যতে একজন বাগ্মী বলিয়া পরিচিত হইবেন। তাঁহা-দিগের সে আশা বিশেষভাবেই সফল হইয়াছে।

বি-এ পাশ করিবার পর চিত্তরঞ্জন সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিবার জন্য বিলাত গমন করেন। সেখানে তিনি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। এই সময় সুপ্রসিদ্ধ কর্ম্ম-বীর দাদাভাই নৌরজী ভারতের অভিযোগ গুলি স্বয়ং বিলাতের পার্লেমেণ্টের সমক্ষে জ্ঞাপন করিবার জন্য বিলাতের ফিনস্‌বারি হইতে নির্ব্বাচিত হইয়া পার্লেমেণ্টের সভ্য হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। চিত্তরঞ্জন তখন সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিয়া কিছুদিনের অবসর পাইয়াছেন, তখনও কিন্তু পরীক্ষার ফল বাহির

হয় নাই। তিনি সেই সময় দাদাভাইয়ের নির্ব্বাচন সমর্থন করিয়া বিলাতের নানাস্থানে বক্তৃতা দেন। সেই সকল বক্তৃতায় তিনি ভারতবাসীর পার্লেমেণ্টের সভ্য হওয়া কেন ভারত ও ইংলণ্ড উভয়েরই কল্যাণকর তাহাই বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। মোটকথা তাঁহার বক্তৃতাগুলি এমন হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল যে বিলাতের সংবাদপত্রগুলিতে উহাদের ভূয়সী প্রশংসা বাহির হয়। কিন্তু যখন সিভিলসার্ভিস পরীক্ষার ফল বাহির হইল তখন দেখা গেল যে সে বৎসর যতগুলি পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রকে চাকরী দেওয়ার কথা ছিল তাহা অপেক্ষা একজন কম দেওয়া হইয়াছে এবং পরীক্ষায় চিত্তরঞ্জনের স্থান তাহাদের নিম্নেই হইয়াছে। এখনও তিনি হাসিতে হাসিতে অনেক সময় এই কথার উল্লেখে বলিয়া থাকেন—"I came out first in the unsuccessful list" অর্থাৎ "আমি অকৃতকার্য্য পরীক্ষার্থীদিগের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলাম।" তাঁহার এই সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় অকৃতকার্য্যতায় তাঁহার পিতা ও অন্যান্য আত্মীয়েরা প্রথমে খুবই দুঃখিত হইয়াছিলেন, কারণ সে সময় চিত্তরঞ্জনের পিতার আর্থিক অস্বচ্ছলতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছিল, প্রচুর ঋণের দায়ে তখন ভুবনমোহন অশান্তিতে বাস করিতেছিলেন। এই সময়ে চিত্তরঞ্জন বাঁধাধরা মাহিনার কোনও বড় চাকরী লইয়া আসিলে সংসারের কিছু স্বচ্ছলতা হইবে ইহাই সকলে ভাবিয়াছিলেন কারণ প্রতিভাবান্ হইলেও ব্যারিষ্টারিতে পসার করা সময়সাপেক্ষ, ধৈর্য্য সহকারে কিছুদিন অপেক্ষা করিতেই হইবে। যাহা হউক

চিত্তরঞ্জন গ্রেসইনে প্রবেশ লাভ করিয়া সম্মানের সহিত ব্যারিষ্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৯৩ সালে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন।

চিত্তরঞ্জনের পুত্র কন্যারা এখনও অনেক সময় হাসিতে হাসিতে বলিয়া থাকেন—"বাবা যদি আই, সি, এস, পাশ করিয়া আসিতেন তবে হয় ত এতদিনে অন্য বাঙ্গালী সিভিলিয়ানদের মতই সাহেব বনিয়া যাইতেন এবং আমরাও সঙ্গে সঙ্গে না সাহেব না বাঙ্গালী এমন একটা কিম্ভূত কিমাকার জীব হইয়া উঠিতাম।" সত্যই বোধ হয় পূর্ব্ব হইতে ভাগ্যবিধাতা তাঁহার হৃৎ-শতদল দেশ জননীর চরণরাগে রঞ্জিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাই হয়ত তাঁহাকে দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইতে হয় নাই। সিভিলিয়ান হইয়া আসিলে তিনি দেশের জন-সাধারণের সহিত মিশিবার সুযোগ পাইতেন না এবং দেশের জনহিতকর কার্য্যে মন দিতেও পারিতেন না। কেবল এই "Heaven born service"এর উচ্চ শিখরে উঠিবার প্রয়াসে তাঁহার সকল শক্তি প্রয়োগ করিতে হইত। স্বর্গীয় সাহিত্যসম্রাট্ "বন্দে মাতরম্" মন্ত্রের উদ্গাতা বঙ্কিমচন্দ্রও এই দাসত্ব শৃঙ্খলের জন্য আক্ষেপ করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং ভগবান্ যে চিত্তরঞ্জনকে দাস হইতে দেন নাই সেই জন্য সেই সময়ে তাঁহার আত্মীয় স্বজনেরা দুঃখিত হইলেও দেশবাসিরা ভগবানের নিকট চিরকৃতজ্ঞ।

সৌন্দর্য্যসম্পদে অমরাবতীতুল্য মনোরম আধুনিক সভ্যতার লীলাকেন্দ্র বিলাতের চাকচিক্যময় বিলাসব্যসনের মধ্যে অকস্মাৎ উপনীত হইয়া প্রথম প্রথম কোন্ বৈদেশিক যুবকের না নয়ন

ধাঁধিয়া যায়? একটা নূতন চমকে অনেক শিক্ষার্থীই অল্পবিস্তর আত্মহারা হইয়া যায়। চিরকাল সংকীর্ণ বিলে থাকিয়া শফরী মৎস্য যেমন সাগরে আসিয়া পড়িলে দিশাহারা হইয়া যায়, চঞ্চলবুদ্ধি ভারতীয় যুবকেরাও তেমনি বিলাতের স্বাধীন নিঃসঙ্কোচ মেলামেশা ও আবহাওয়ার মধ্যে আসিয়া প্রায়ই মতি স্থির রাখিতে পারে না। মানুষের স্বভাবই এই যে সে বাহির হইতে যাহা সুন্দর দেখে তাহারই অনুকরণ করিবার জন্য বহ্নিপ্রবেশোন্মুখ পতঙ্গের মত ছুটিয়া যায়—অনেক সময়ে ভাল মন্দ বিচারের শক্তি তাহার থাকে না। যুবক চিত্তরঞ্জনও বিলাতে পৌঁছিয়া সাহেবিয়ানার বিশেষ পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছিলেন। সাহেবী বেশভূষা সাহেবী হাবভাব, সাহেবী আদব কায়দা তাঁহার চক্ষে অতি মনোরম হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু সকল সময়েই তাঁহার মনটি খাঁটি দেশী ছিল, তাঁহার কোট পেণ্টুলানের ভিতর হইতে প্রকৃত স্বদেশপ্রেমিক উঁকি মারিত। তাঁহার বিলাতে অবস্থান কালের একটি বিশিষ্ট ঘটনা হইতে ইহার সত্যতা প্রমাণিত হইতে পারে। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে একদিন জেমস্ ম্যাকলিয়ন নামক পার্লামেণ্টের একজন সভ্য একটি বক্তৃতায় প্রসঙ্গক্রমে মুসলমানদিগকে দাস এবং হিন্দুদিগকে চুক্তিবদ্ধ দাস বলিয়া মিথ্যা অপবাদ দিয়াছিলেন। তরুণ যুবক চিত্তরঞ্জন সেই সময়ে লণ্ডনে আইন অধ্যয়ন করিতেছিলেন, তাঁহার দেশপ্রেমিক হৃদয় ইহাতে বড়ই ব্যথিত হইল। তিনি চেষ্টা করিয়া ইংলণ্ডবাসী ভারতবাসিগণকে একত্র করিয়া লণ্ডনের এক্সটার হলে একটি সভার

প্রতিষ্ঠান করিলেন এবং সেখানে এই ব্যাপারের তীব্র প্রতিবাদ করিলেন। লণ্ডনে একটা সরগোল পড়িয়া গেল, প্রসিদ্ধ কাগজ গুলিতে চিত্তরঞ্জনের বক্তৃতার আলোচনা প্রসঙ্গে এই বিষয়ের আন্দোলন চলিতে লাগিল। ইহার অল্প পরে ইংলণ্ডের উদারসজ্ঘ গ্লাডষ্টোনের সভাপতিত্বে ওলড্‌হামে এক প্রকাণ্ড সভার আহ্বান করিলেন, সেই সভায় চিত্তরঞ্জন নিমন্ত্রিত হইয়া তীব্র ভাষায় এই বিষয়ের সমালোচনা করেন। ফলে জেমস্ মাকলিয়ানকে সাধারণের সমক্ষে অপরাধ স্বীকার করিতে হইয়াছিল এবং ইহাতে তাঁহার সভ্যপদও গিয়াছিল। এই ব্যাপারে চিত্তরঞ্জনের পরবর্ত্তী কালের বাগ্মিতা স্বদেশ প্রেমিকতা ও তেজস্বিতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। মানুষের পরিণত চরিত্র একটি পূর্ণাবয়ব বৃক্ষের মত, ইহার অঙ্কুর অবস্থা দেখিলে ভবিষ্যৎ পরিণতি সম্বন্ধে অনেকটা অনুমান করা যায়। এইরূপ ছোট ছোট ঘটনাতেই মানুষের প্রকৃত মনুষ্যত্ব বাহির হইয়া পড়ে এবং উহারাই ভবিষ্যতের পথপ্রদর্শক।

——o——

দ্বিতীয় অধ্যায়

কর্ম্মজীবনের আরম্ভ ও সাহিত্য-সেবা

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া চিত্তরঞ্জন দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী করিতে থাকেন। তাঁহার বিলাতগমনের সময় হইতে তাঁহাদের সংসারে আদৌ স্বচ্ছলতা ছিল না, তাঁহার পিতার এত অধিক ঋণ হইয়াছিল যে তাহা তখন পরিশোধ করা অসম্ভব। পিতৃভক্ত চিত্তরঞ্জন ব্যারিষ্টারি করিতে আরম্ভ করিয়াই ঋণভার নিজে গ্রহণ করিলেন। কিন্তু উপার্জ্জন তখনও নূতন ব্যারিষ্টারের তেমন কিছু ছিল না, সুতরাং ঋণদায় হইতে অব্যাহতি পাইবার মত অর্থ কোথায় পাইবেন। তাই নিরুপায় হইয়া আইন ব্যবসায় আরম্ভ করিতে না করিতে তিনি পিতার সহিত একত্র ইন্‌সল্‌ভেন্সি কোর্টের সহায়তা গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। পরের অর্থ আত্মসাৎ করা কিছু তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না, অথচ গত্যন্তর না পাইয়া তাঁহাকে দেউলিয়া বলিতে হইয়াছিল বলিয়া তিনি বিশেষ মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি বুঝিয়াছিলেন কর্ত্তব্যের ডাক সবার উপরে, তাহার কাছে আত্মমর্য্যাদা জ্ঞান ও স্বার্থোন্নতি-বাসনা বলিদান দিতেই হয়। পিতার ঋণভার বহন করা যে তাঁহার

পক্ষে একটা প্রকাণ্ড কর্ত্তব্য ছিল শুধু তাহাই নয়, ইহা তাঁহার গৌরবের কার্য্য। পিতার উপযুক্ত পুত্রের মত তাঁহার সুখ দুঃখ মান অপমান মর্য্যাদা ও উপেক্ষা সমান ভাবে না অধিক অংশই নিজে গ্রহণ করিতে পারা চিত্তরঞ্জন একটা অহঙ্কারের কার্য্য বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। ইহাই তাঁহার কর্ম্মজীবনের প্রথম বীরত্ব ও তেজস্বিতার নিদর্শন।

আইন ব্যবসায়ের প্রথম অবস্থা বড়ই বিরক্তি জনক। আশার আলোক ফুটিতে না ফুটিতে নৈরাশ্যের অন্ধকারে নিমজ্জিত হওয়া যে কি ভীষণ কষ্টকর অবস্থা তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। সে সময় ভবিষ্যতের দিকে চাহিলে দেখা যায় যেন চারিদিকে অন্ধকার আলোকের লেশ নাই; যেন সারা জীবনটা এক বিরাট মরুভূমি, মাঝে মরীচিকার মত আশার নির্ঝরিণী দেখা যাইতেছে। তারপর যদি প্রচুর ঋণদায়ের অশান্তি ও সমাজে পদগৌরবের লাঘব আসিয়া যোগ দেয় তবে সে অবস্থা যে কি ভীষণ হয় তাহা কেবল কল্পনায় সম্ভব। অমিত-প্রতিভার অধিকারী হইয়াও ব্যারিষ্টারির প্রথম অবস্থাতে পৈতৃক ঋণ ও নানাবিধ আর্থিক অস্বচ্ছলতার জন্য চিত্তরঞ্জন ব্যবসায়ে দ্রুত উন্নতি করিতে পারেন নাই। কিন্তু। একটি বিষয়ে তাঁহাকে ইহার অপেক্ষা অধিকতর মনঃকষ্ট দিয়াছিল। দেউলিয়া বলিয়া তিনি নিঃশঙ্কোচে দেশের কাজে আপনাকে নিযুক্ত করিতে পারিতেছিলেন না। এইরূপ অবস্থায় না পড়িলে হয়ত বহুদিন পূর্ব্বেই দেশের সকল প্রকার শুভ কার্য্যেও

রাজনীতিক আলোচনায় যোগদান করিয়া আপনার অসাধারণ দেশপ্রেমিকতার পরিচয় দিতে পারিতেন এবং হয়ত যে অদ্ভুত মণীষা কার্য্যদক্ষতা ও স্বদেশপ্রীতির দ্বারা তিনি এক্ষণে সর্ব্বসাধারণের হৃদয় জয় করিয়া লইয়াছেন তাহার দ্বারাই অনেক পূর্ব্বে তিনি জনসাধারণের নেতৃত্বের সম্মান লাভ করিতে পারিতেন। কিন্তু উপায় কিছু ছিল না, তাঁহার আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা ইহার অনুকূল ছিল না। যদিও তাঁহার অনন্য-সাধারণ আইনজ্ঞান ও কর্ম্মশক্তি হাইকোর্টে প্রবেশ করিবার সময় হইতেই লক্ষিত হইয়াছিল তথাপি নানাকারণে সে শক্তি অনেক বৎসর পর্য্যন্ত বিকাশ পায় নাই। মোট কথা আপনার পসার বৃদ্ধি ও সুনাম প্রচারের জন্য ব্যারিষ্টারদের সর্ব্বদা কলিকাতায় থাকিয়া ব্যবসায় করা প্রয়োজন। কিন্তু চিত্তরঞ্জনের অর্থের অস্বচ্ছলতা খুব বেশীই ছিল, দুবেলা নাকি সমানে পুষ্টিকর সুখাদ্য সংগৃহীত হইতে পারিত না। বাস্তবিকই এইরূপ আর্থিক দুরবস্থায় বাধ্য হইয়া শীঘ্র শীঘ্র অর্থাগমের সুবিধার জন্য তিনি প্রায়ই মফঃস্বলে যাইতে থাকিতেন, কারণ নূতন ব্যারিষ্টারের পক্ষে মফঃস্বলে ব্যবসায় পরিচালনা প্রথম প্রথম অধিকতর লাভ জনক। ইহাতে তাঁহার পসার বৃদ্ধির অনেক ক্ষতি হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃত প্রতিভা ত কখন লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিতে পারে না, এবং সুযোগ উপস্থিত হইলে সেই প্রতিভা ফুটিয়া উঠিবেই। চিত্তরঞ্জনের ব্যবসায়ী প্রতিভা এইরূপ একটা ঘটনা উপলক্ষ করিয়া দেশবাসীর প্রশংসামান দৃষ্টির গোচরে আসিয়া পড়িল।

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দ বাঙ্গালাদেশের এক চিরস্মরণীয় বৎসর। নূতন ভাব-গঙ্গার নূতন জোয়ারে বাঙ্গালা তখন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল। আশার রঙীন নেশায় বাঙ্গালী যুবকেরা তখন ভরপুর। "লক্ষ পরাণে শঙ্কা না মানে, না রাখে কাহারো ঋণ"। কোন্ দৈবী-স্পর্শে যেন বাঙ্গালীর ঘুমন্তপ্রাণ সজাগ হইয়া উঠিয়াছিল। "জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনা হীন" ইহাই ছিল সেই সময়কার বাঙ্গালার তরুণ প্রাণের আদর্শ। সমগ্র বাঙ্গালার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বঙ্গভঙ্গ করিয়া লর্ড কর্জ্জন যে মনুষ্যত্বের অবমাননা করিয়াছিলেন, তাহাতেই সমস্ত দেশটা বাত্যাবিক্ষুব্ধ সাগর বক্ষের মত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল; সেই চাঞ্চল্য হইতেই প্রকৃতপক্ষে স্বদেশীর মহান্দোলনের সৃষ্টি। বাঙ্গালীদিগের আত্মসম্মানবোধ রাজপুরুষদিগের ব্যবহারে প্রতি-পদে ক্ষুন্ন হইতেছিল বলিয়াই তাহারা তাহাদিগের ক্ষীণপ্রাণের শক্তি দিয়া ইংরাজের দুর্জ্জয়শক্তি প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। এই প্রবল আন্দোলনের স্রোত বন্ধ করিবার জন্য অল্পদিনের মধ্যেই বিশেষ ধরপাকড় পড়িয়া গেল। স্বদেশীর মামলা মোকদ্দমাতে দেশ প্লাবিত হইয়া পড়িল। এই সময়েই শ্রীযুত অরবিন্দ ঘোষের বিরুদ্ধে সেই চিরপ্রসিদ্ধ ষড়যন্ত্র-মোকদ্দমার সূত্রপাত। এই মোকদ্দমায় চিত্তরঞ্জন অরবিন্দের পক্ষ সমর্থন করেন। ইহাতে তাঁহার অদ্ভুত মোকদ্দমা পরিচালন শক্তির পরিচয়ে হাইকোর্টের ব্যবহারজীবগণ সসম্মানে তাঁহাকে শীর্ষ-স্থান ছাড়িয়া দেন। এই মোকদ্দমা গ্রহণ করিয়া চিত্তরঞ্জন

বিশেষ আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিয়াছিলেন। ছয় মাসের অধিককাল তিনি ইহাতে নিযুক্ত ছিলেন এবং যে সামান্য অর্থ তিনি ইহার জন্য পাইয়াছিলেন তাহা একমাস তাঁহার সংসারের দৈনিক ব্যয়ের পক্ষেই যথেষ্ট ছিল না, সুতরাং তাঁহাকে এই উপলক্ষে কিছু ঋণগ্রস্ত হইতে হয়। তারপর যেদিন স্বদেশ-গৌরব অরবিন্দের মুক্তিতে সমগ্র বাঙ্গালায় একটা আনন্দের হিল্লোল খেলিয়া গেল, সেই সঙ্গে অরবিন্দের মোকদ্দমা পরিচালক চিত্তরঞ্জনের যশঃসৌরভও চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। ইহার কিছুদিন পরেই তিনি ঢাকার বিখ্যাত ষড়যন্ত্র মোকদ্দমায় আসামীদিগের পক্ষ সমর্থন করেন। তাহাতেও তিনি পারিশ্রমিক অর্থ গ্রহণ না করিয়া বিশেষ ত্যাগের পরিচয় দিয়াছিলেন এবং সেই সময়কার কয়কট মোকদ্দমাগুলি বিনা পারিশ্রমিকে চালাইয়া দেশের কৃতজ্ঞতা ও সুখ্যাতি অর্জ্জন করিলেন। তখন তিনি হাইকোর্টে ফিরিয়া আসিয়া সেখানকার ব্যারিষ্টারির ভগ্নসূত্র গ্রহণ করিলে এবং অল্পদিনের মধ্যে একজন প্রধান ব্যারিষ্টার বলিয়া পরিগণিত হইয়া যথেষ্ট অর্থ ও কীর্ত্তি উপার্জ্জন করিতে আরম্ভ করিলেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি নিরুপায় হইয়া চিত্তরঞ্জন পিতার সহিত ইন্‌সল্‌ভেন্সি কোর্টের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু পরের অর্থ আত্মসাৎ করা এই দেউলিয়া হইবার উদ্দেশ্য ছিল না। যে চিত্তরঞ্জন পরজীবনে দুঃখীর দুঃখ মোচনের জন্য, অনাথ আতুর ও অন্নহীনের অভাব দূর করিবার

জন্য, নিঃসহায় দরিদ্র ছাত্রের বিদ্যাশিক্ষার সুবিধা করিয়া দিবার জন্য উপার্জ্জিত অর্থ রাশি ধূলি-মুষ্টির ন্যায় ব্যয় করিয়াছেন সেই চিত্তরঞ্জন উত্তমর্ণকে ফাঁকি দিবেন ইহা ধারণা করাও অন্যায়। তাই তিনি ব্যবসায়ে উন্নতি ও অর্থাগমের সঙ্গে সঙ্গে পিতৃঋণ পরিশোধ করিয়া দেউলিয়া নামের কলঙ্ক মুছিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন এবং যথাসময়ে সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিয়া কর্ত্তব্য-পরায়ণতা ও স্বার্থত্যাগের মহান্ আদর্শ দেখাইয়া জগৎকে স্তম্ভিত করিলেন! সেই জন্যই জষ্টিস্ ফ্লেচার বলিয়াছিলেন—"কোন ব্যক্তি দেউলিয়া বলিয়া সমস্ত ঋণ স্বীকার করিয়া উহা পরিশোধ করে এইরূপ দৃষ্টান্ত জগতের ইতিহাসে আমি প্রথম দেখিলাম।" এই অদ্ভুত ধর্ম্মনিষ্ঠায় চিত্তরঞ্জন এক নূতন পবিত্র আলোকে বিভাসিত হইলেন।

ঋণমুক্তির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত চিত্তরঞ্জনের সঙ্কুচিত মন তাঁহাকে দেশের কাজে অগ্রসর হইতে বাধা দিতেছিল। কিন্তু তাঁহার প্রতিভা তখনও সুপ্ত ছিল না, কাব্যসাহিত্যের মধ্য দিয়া ইহা বিকাশ পাইতেছিল। বিলাত যাইবার পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার কাব্য-শক্তির স্ফূরণ হইয়াছিল। তাঁহার কাব্যালোচনার মূলে কোনও রূপ ইতিহাস সংশ্লিষ্ট আছে কিনা জানিনা। চিত্ত-রঞ্জনের বিলাত হইতে প্রত্যাগমনের অল্পদিন পরে ১৮৯৫ সালে তাঁহার প্রথম কাব্য "মালঞ্চ" প্রকাশিত হইল। ইহা কতক-গুলি খণ্ড কবিতা ও গীতি কবিতার সমষ্টি। তরুণ প্রাণের উপর দিয়া বসন্তের হিল্লোল বহিয়া যে উচ্ছ্বাস জাগাইয়া দিয়া

যায় মালঞ্চে তাহারই কবিত্বময় প্রকাশ। ইহাতে সেই সময়কার প্রেমসাধনা, রূপের ধ্যান, ও সহজ সতেজ একটা আবেগ ফুটিয়া উঠিয়াছে। তরুণ কবির নূতন প্রেম একটা সুখ স্বপ্নের মত রজনীর অন্ধকারে শ্রান্ত-ইন্দুর ম্লান কর-লেখার মধ্যে কুসুমের সুরভি নিঃশ্বাসে কোন অজ্ঞাত পুলক জাগাইয়া তোলে, সে প্রেম স্নিগ্ধ।মৃদু আলোকের মত নববিকশিত প্রাণের তীরে স্বপ্নের তরী আনিয়া উপস্থিত করে, সে প্রেম ভুজঙ্গের জীবন জড়াইয়া যেন মরণ নিঃশ্বাস ফেলিয়া যায়। তাই কবি বলিতেছেন—

তোমার ও প্রেম সখি! শাণিত কৃপাণ!
দিবানিশি করিতেছে হৃদিরক্ত পান।
নিত্য নব সুখ ভরে,
ঝলসিছে রবি করে;
রজনীর অন্ধকারে সে আলো নির্ব্বাণ!

সে প্রেম নিষ্ঠুর অদৃষ্টের মত কখনও কখনও কাঁদায় তবু জীবন মরণ যেমন অদৃষ্টের কাছে লুটিয়া থাকে, পরাণও যে তেমনি রাজীবচরণে লুটাইতে থাকে। তাই কবি বলিলেন—

তোমার ও প্রেম সখি! অমর জীবন—
শান্তিরূপী নন্দনের চির-আরাধন!
অসার স্বপন লয়ে,
থাকিলে নিদ্রিত হয়ে,
ধূলাভরা ধরণীর ধূলি নিমগন।

অথবা—

তোমার ও প্রেম সখি! মরণ সমান
জীর্ণ শ্রান্ত জীবনের শান্তি-আবরণ!

কোমল তুষার কর,
রাখিয়া ললাট পর,
জুড়ায় জ্বলন্ত জ্বালা, আনিয়া নির্ব্বাণ।

একদিন সূর্য্যালোক-বিভাসিত সুন্দর প্রভাতে প্রস্ফুটিত-কুসুম-সৌরভ বহিয়া বসন্ত-বায়ু একটা চঞ্চল পুলক একটা রঙীন স্বপ্ন ছড়াইয়া ধরাবক্ষে মোহের সৃষ্টি করিতেছিল, সেই সময়ে তরুণ কবি জীবনের গান গাহিয়া উঠিলেন—

আসে প্রেম অনন্ত সুন্দর!
তুলে দেয় হস্তে মোর
রক্তফুল তার,
হৃদয়ে ঢালিয়া দেয়
মধুগন্ধ ভার;
স্বপ্ন দেয় ভরিয়া অন্তর—
গোপনে চুম্বিয়া যায় আমার অন্তর
এ প্রেম সুন্দর!

কোন্ সুরাঙ্গনা চরণ-আভাসে গগনে ফুল ফুটাইয়া স্মিত-হাস্যে চারিদিক সৌন্দর্য্যে ভরিয়া নামিয়া আসিতেছে, তাই কবি গাহিলেন—

প্রাণপূর্ণ অপূর্ব্ব স্বপনে
অস্ফুট সঙ্গীত তালে
ফেলেছি চরণ ;
আনন্দে ফুটিছে পুষ্প
আরক্ত বরণ
ধরণীর বসন্ত কাননে !—
দেবতার হাস্যভাতি ভাসিছে গগনে
অপূর্ব্ব স্বপনে

একদিন যখন জীবনের আধ আলো আধ অন্ধকারের মধ্যে তরুণ প্রাণের আশাও লক্ষ্য হারাইয়া ভগবানের চরণে নিস্ফল আবেদন করিয়া উত্তর পাইলেন না, তখন কবির বিশ্বাসহীন হৃদয় বিদ্রোহী হইয়া উঠিল—

বুঝেছি বুঝেছি তবে
কহিবেনা কিছু ! তৃষার্ত্ত জিজ্ঞাসা মোর
আনিছে ফিরায়ে তব লৌহবক্ষ হ'তে
রুদ্ধভাষা অশ্রুসিক্ত লজ্জানত আঁখি !
শক্তিশীল, দৃষ্টিহীন, শ্রবণহীন,
নির্ম্মম নিষ্ঠুর তুমি পাষাণের মত।

তাই আর একটি কবিতায় ও কবি বলিতেছেন—মিথ্যা কথা, ঈশ্বর নাই, "সত্য বলে পূজা করি অলীক স্বপন"—

ঈশ্বর ঈশ্বর বলি অবোধ ক্রন্দন,
প্রচণ্ড ঝটিকা বহি গগন ভরিয়া

আমাদের সুখশান্তি ল'তেছে হরিয়া,
বাড়াইয়া আমাদের বিজন বেদন !

তরুণ কবির নিকট ধরণীর সুখ দুঃখই সহানুভূতির সামগ্রী, পাপপুণ্যভরা গোটা মানুষটাই তাঁহার প্রিয়, তাই তিনি ধর্ম্ম-ব্যবসায়ীদিগকে কথায় কথায় ঈশ্বরের সাক্ষ্য দিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া সাধারণের পাপ দেখাইতে বারণ করিয়াছেন, কারণ ইহা তাহাদিগের চক্ষে মোহান্ধকার আনিয়া একটা অহঙ্কারের সৃষ্টি করে। তাই কবি বলিয়াছেন—

তুমি উচ্চ হ'তে উচ্চ, ধার্ম্মিকপ্রবর !
তুচ্ছ করি অতি তুচ্ছ আমাদের প্রাণ
ওগো ! কোন্ শূন্য হ'তে আনিয়া ঈশ্বর,
জীবনে তাহারি কর আরতির গান ?
ভ্রাতার ক্রন্দন শুনি চেয়োনা ফিরিয়া,
ধরণীর দুঃখ দৈন্য আছে যাহা থাক্ ;
ঊর্দ্ধমুখে পূজা কর দেবতা গড়িয়া,
প্রাণপুষ্প অযতনে শুকাইয়া যাক্।

আর এই তথা কথিত ধার্ম্মিকদিগের আচরণ যে মিথ্যা ছলনা মাত্র ; তাই কবি শুনাইতেছেন—

ওহে সাধু ! আমি জানি, অন্তর তোমার
ক্ষুধিত তৃষিত সদা যশ লালসায় ;
ধরণীর করতালি উৎসাহ অপার
গুঞ্জরে শ্রবণে শত মধুপের প্রায়।

এস এস কাছে লয়ে মানবের প্রাণ
কাজ কি এ মিথ্যাভরা দেবতার ভাণ।

এই কারণেই ব্রাহ্মদিগের সঙ্কীর্ণ সহানুভূতিতে আঘাত পাইয়া কবি তাহাদিগের নিজের গণ্ডীর বাহিরে সকলকে তুচ্ছ করা ভাব লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন—

অসার সকল জ্ঞান ? ওহে ব্রহ্মজ্ঞানী !
তবে তুমি কার কর অত অহঙ্কার ?
আপনারি উচ্চারিত মেঘমন্দ্র বাণী
আপনার মনে আনে মোহ-অন্ধকার।
ক্ষুদ্র তুমি, ক্ষীণ প্রাণে কেমনে ধরিবে
অসীম অনন্ত শক্তি মহা দেবতার ;
এ শূন্য বিশ্বের বক্ষে কাহারে বরিবে ?
বৃথা বহ আপনার পুষ্প অর্ঘ্যভার !

এই নিরীশ্বরবাদিতা বা নাস্তিকতা, যে নামে সাধারণতঃ আমরা এই ভাবকে অভিহিত করি, চিত্তরঞ্জনের তরুণ বয়সের কবিতাগুলিকে একটা গোলযোগের হেতু করিয়া তুলিয়াছিল। শুনিয়াছি ইহাতে মহারথী ব্রাহ্ম আচার্য্যদিগের অভিমানে আঘাত লাগিয়াছিল। 'মালঞ্চ' প্রকাশিত হইবার কয়েক বৎসর পরে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে মাঘ মাসে বিজনীষ্টেটের ভূতপূর্ব্ব ম্যানেজার স্বর্গীয় বরদা হালদার মহাশয়ের কন্যা বাসন্তী দেবীর সহিত চিত্তরঞ্জনের বিবাহ হয়। সেই বিবাহ সভায় নাকি অভিমান-ক্ষুব্ধ শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ ব্রাহ্মরা উপস্থিত ছিলেন না

কিন্তু তাহাতে চিত্তরঞ্জন আপনাকে দোষী ভাবিয়া দুঃখিত হন নাই।

যাহা হউক মালঞ্চের যে কবিতাটিতে তরুণ কবির নির্ভীকতা ও করুণহৃদয়ের পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল, সে প্রসিদ্ধ কবিতাটির নাম "বারবিলাসিনী"।" এ কবিতাটি এমন সহৃদয়তা মাখান এবং এত সুন্দর করুণরসের ভাব ছড়ান যে ইহা রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত কবিতা "পতিতার" পার্শ্বে স্থান পাইতে পারে। ইহাতে বারবিলাসিনীর চিরলাঞ্ছিত করুণ জীবনকাহিনী বর্ণিত হইয়াছে; তাহার অধররঞ্জন, তাহার পুষ্পগন্ধ, তাহার তনু ঢাকা নীলবাস, তাহার অলক্তক-রঞ্জিত-চরণে নূপুর-কিঙ্কিণী, তাহার মর্ম্মহীন আবেগ, তাহার শুষ্ক বিলাস, তাহার রজনীর কলঙ্ক সবটুকুই এমন করুণভাবে বর্ণিত হইয়াছে, যে তাহা সহজেই আমাদের মর্ম্ম স্পর্শ করে। তারপর বিলাসিনীর শেষ কথা বড়ই করুণ—

"আমি যেন চিরদিন ঋণী!
অপার ঐশ্বর্য্য ল'য়ে,
বিলাই ভিখারী হয়ে,
বাসনাবিহীন উদাসিনী!
লালসা উল্লাসহীন, পূর্ণ উদাসিনী!
কে করেছে মোরে চিরঋণী!
ওগো আমি যৌবনে যোগিনী!
এ বিশ্বলালসা ছাই,
সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া তাই,
চলিয়াছি কলঙ্ক বাহিনী!

মর্ম্মহীন কর্ম্মহীন কলঙ্ক-বাহিনী !
চিরদিন যৌবনে যোগিনী !
কার অভিশাপে নাহি জানি !
কোন্ মহাপ্রাণে ব্যথা—
দিয়াছিনু, তাই হেথা,
প্রাণহীন প্রেম-বিলাসিনী !
সবারে বিলাসি তাই বারবিলাসিনী !
তারি পাশে চির-কলঙ্কিনী !"

'মালঞ্চে'র পর চিত্তরঞ্জনের আর একটি কবিতা পুস্তক "মালা" প্রকাশিত হয়। ইহার দুই একটি কবিতা মালঞ্চেরও আগেকার রচনা। চিত্তরঞ্জনের কাব্যজীবনের ক্রমবিকাশে মালার স্থান মালঞ্চের পরেই। ইহার প্রেম কবিতাগুলি অধিকতর সংযত, ভাব আরও গভীর—

কেমন সে ভালবাসা ? বলা কি সে যায় ?
সকল জীবন আর সব স্বপ্ন গায়
তোমারি তোমারি গীতি ! স্রোতস্বতী যথা
সমুদ্রের গান গাহে, তারি পানে ধায়
আকুল আশায় !

এই 'মালা' কাব্যেই সেই ব্যাকুলতার সুর ফুটিয়া উঠিয়াছে, যাহা "অন্তর্য্যামী" ও "কিশোর কিশোরী"তে পরিণতি লাভ করিয়াছে। কবির জীবনে একটা নূতন আলো দেখা দিয়াছে, তাই তিনি বলিতেছেন—

আজি এ সন্ধ্যার মাঝে তব বাতায়নে
কেন রাখিয়াছ ওগো! প্রদীপ জ্বালিয়া?
তোমার ও প্রদীপের কনক কিরণে
আমার সকল মন উঠে উজলিয়া!

তখন তাঁহার আবেগ বিহ্বল প্রাণে এই জিজ্ঞাসাই জাগিতেছিল—

"কি দিয়ে কেমন করে জ্বালায়ে রেখেছে ওই
অপূর্ব্ব প্রদীপ খানি?
কি দিয়ে জ্বালিলে বল, হে চির-কৌতুকময়ী
রহস্য প্রদীপ খানি?
সকল গগন ঘেরা সাঁঝের স্বপন ছায়া
সকল ধরণী পরে বিছায়েছে ম্লান মায়া!
এরি মাঝে সত্যরূপে উজলি উঠিছে ওই!
তোমার প্রদীপ খানি!
কি সত্য সুন্দর রূপে আঁধারে জ্বলিছে ওই
অপূর্ব্ব প্রদীপ খানি!

এই প্রেমের প্রদীপ যখন কবির প্রাণে আলো ছড়াইয়া দিল, তখনই তিনি বলিয়া উঠিলেন—

ওগো প্রিয়, তুমি মোর সর্ব্ব জীবনের
চির প্রেমার্জ্জিত শত তপস্যার ফল!

তারপর তুমি যদি কখন এস—

খুলিয়া হৃদয় দ্বার আমি বিছাইব
যত না সৌন্দর্য্য আছে, যত না স্বপন ;
সর্ব্ব কোমলতা মোর আমি পেতে দিব
তুমি ক'র ওগো কর আমার জীবন
তোমার চরণ ভুমি !

তাই কবি আকুল প্রাণে প্রার্থনা করিয়াছেন—

নিখিলের প্রাণ তুমি!   তুমি হে আমার
দিবসের দিনমণি, নিশার আঁধার ;
জাগরণে কর্ম্মভুমি
শয়নের স্বপ্ন তুমি,
ওগো সর্ব্ব প্রাণময় !   তুমি যে আমার !

এই প্রাণে প্রাণে মিলন কেমন করিয়া হইবে, তাই তিনি নিবেদন করিয়াছেন—

আমার পরাণ ভরি উঠে যত গান
তোমার পরাণ হ'তে পায় যেন প্রাণ !
আমারে ভাসায়ে রাখ পরাণ পরশে
আমারে ডুবায়ে দাও পরশ হরষে !

"মালা"র পর "সাগর-সঙ্গীত" রচিত হইয়াছিল, কিন্তু প্রকাশ হিসাবে ইহার "মালা"র পূর্ব্বগামী। সাগর হিল্লোলের তালে তালে কবির হৃদয়ে যে ভাব তরঙ্গ ফুটিয়া উঠিয়াছিল, সাগর-সঙ্গীতের কবিতাগুলি তাহারই রূপ কাব্যের মধ্যে ধরিয়া

রাখিয়াছে। মানসবীণায় নূতন ভাবের ঝঙ্কারের সঙ্গে কবি বলিয়া উঠিলেন—

আজিকে পাতিয়া কান,
শুনিছি তোমার গান,
হে অর্ণব! আলোঘেরা প্রভাতের মাঝে;
একি কথা! একি সুর!
প্রাণ মোর ভরপুর,
বুঝিতে পারিনা তবু কি জানি কি বাজে
তব গীত মুখরিত প্রভাতের মাঝে!

প্রভাতের তরঙ্গে সঙ্গীত বাজিয়া যে সোনার স্বপ্ন সৃষ্টি করিয়া গিয়াছে তাহাই আকাশে বাতাসে ভাসিয়া কবির হৃদয় ভরপুর করিয়া দিয়াছে, তাই কবির মনে হইতেছে কি যেন পরিবর্ত্তন হইয়া গেল—

কি মোরে করেছ আজ! মনখানি মম,
শত শত তন্ত্রীভরা গীতযন্ত্র সম,—
পরশি তোমার করে কাঁপিয়া কাঁপিয়া,
গরবে গৌরবে আজ উঠিছে বাজিয়া।

সিন্ধুর অঙ্গে তরুণ উষার আলো পড়িয়া যে স্বপ্নলোকের সৃষ্টি করে, তাহারই রূপের লীলায় বিভোর কবির পরাণ সিন্ধুর চরণে লুটাইতে চায়, তাই কবি বলিতেছেন—

সোনার কমলে আমি মালিকা গেঁথেছি,
দোলাইব আজ তব সোনার গলায়।

একসূত্রে বাঁধা রব আমরা দুজনে
তরুণ ঊষার কোলে স্বপনে বিজনে !

কবির মনে হইতেছে এক হৃদয় উদাস করা করুণ সুর—সাগর চুমিয়া আর গগন ঘুরিয়া কবির প্রাণে আসিয়া বাজিতেছে ; নূতন মোহে নূতন সুরে ভরপুর কবি বুঝিয়া পান না কত যুগ যুগান্তর হইতে সিন্ধু এই পাগল করা বেদনাভরা সঙ্গীত হৃদয়ে ধরিয়া রাখিয়াছে। তার পর সন্ধ্যা যখন নামে নামে, আধো আলো আধো অন্ধকারের মাঝে মেঘগুলি যখন ভাসিয়া যাইতেছে, এই অনিশ্চিত আলোক এই অপূর্ব্ব অন্ধকারের পানে আকাশ যখন অবাক নয়নে চাহিয়া আছে, মুখর তরঙ্গগুলি তখন শান্ত, চঞ্চল বায়ু তখন স্থির, গগন আলোকহীন, চারিদিক মহাশূন্যময়। মনে হইতেছিল যেন এই ধূসর অন্ধকারে সিন্ধু যোগাসনে বসিয়া আপনাকে ডুবাইয়া রাখিয়াছে, তখন কবি আবেগ বিহ্বল প্রাণে বলিতেছেন—

ওগো সিন্ধু! আজ তুমি কোন্ ছায়ালোক জুড়ে
গাহিছ করুণ গীতি দ্বিধায় জড়িত সুরে ?
জীবন মরণ সাথে কি কথা কহিছ আজি ?
কোন্ তন্ত্রী ছিঁড়ে গেছে, কি ব্যথা উঠিছে বাজি ?
তোমার পরাণ হ'তে আমার পরাণ পরে
সকল আলোক আর সকল আঁধার ঝরে।
পরাণ কাঁপিছে এই ছায়ালোকে ছায়াময়,—
একি সত্য ? একি মিথ্যা ? একি আশা ? একি ভয় ?

(৩৪)

"অন্তর্য্যামী" "সাগর সঙ্গীতের" অনেক পরের লেখা। ইহা চিত্তরঞ্জনের কাব্য সৃষ্টির চতুর্থ স্তরের রচনা। ইহা পরিণত বয়সের লেখা। রবীন্দ্রনাথের কাব্যসৃষ্টির প্রত্যেক স্তরই তাঁহার কাব্যের অভিব্যক্তিতে সুপরিস্ফুট, চিত্তরঞ্জনের কাব্য-জীবনের প্রতি স্তর তেমন পরিস্ফুট হয় নাই। "মালঞ্চ" ও "অন্তর্য্যামী"র কবির মধ্যে দশ বৎসরের একটা নিস্তরঙ্গ নিস্তব্ধতা অমাবস্যার নিশীথের মত নিঝুম পড়িয়া রহিয়াছে। সেই অন্ধকারের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া মাঝে মাঝে যে ক্ষণিক বিদ্যুৎ-স্ফুরণ দেখা দিয়াছে, তাহাতে ইহাই প্রমাণ হইয়াছে যে কবির প্রাণ মরে নাই—বাঁচিয়া আছে; আলো নিভে নাই—শিখা জ্বলিতেছে। কবি-প্রতিভা "অন্তর্য্যামী"তে নূতন সুরে নূতন রূপে বাঙ্গালা কাব্যোদ্যানের নূতন ফুলটির মত ফুটিয়া উঠিয়াছে। "অন্তর্য্যামী"র সুর বাঙ্গালার চিরন্তন সুরের বর্ত্তমান যুগে একটা অভিনব বিকাশ। "অন্তর্য্যামী"র কবিতাগুলির পূর্ব্বাপর ধারাবাহিক পারম্পর্য্যে অন্তর্য্যামীর কবির ধর্ম্মজীবনের একটি চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। যেমন—

বুঝি এই প্রেমে লাগে অনেক সাধনা;—
তবে ছেড়ে দিনু আমি করগো রচনা
আমার জীবন লয়ে যাহা তুমি চাও।—
পরাণের তারে তারে আপনি বাজাও।
আমি কাঁদিবনা আর, কথা নাহি কব,
নয়ন মুদি শুধু্য়াপথে পড়ি রব।

মালঞ্চের কবির উপরে পাশ্চাত্য কবিদিগের বিশেষতঃ সুইন্‌বার্ণের প্রভাব লক্ষিত হয়, মাঝে মাঝে রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ উহাতে আছে, কিন্তু "অন্তর্য্যামী"তে আমরা উহার কিছুই পাই না। "অন্তর্য্যামী"র কবির মানসিক বিকাশের পথ অন্ধকারাচ্ছন্ন, অনেক স্থলে তাহা অনুমানসাপেক্ষ। মালঞ্চের কবি অন্তর্য্যামীর স্তরে পৌঁছিবার পূর্ব্বে "মালা"র মধ্যে তাঁহার মানসিক বিকাশের পথে একটা পরিবর্ত্তনের ছবি রাখিয়া গিয়াছেন। "মালা"—"মালঞ্চ" ও "অন্তর্য্যামী"র মধ্যপথের কবিতা। মালঞ্চের কবি যে অন্তর্য্যামীতে আসিয়া পৌঁছিবেন, "মালায়" তাঁহার পূর্ব্বাভাস। অন্তর্য্যামীতে ফুটিয়া উঠিয়াছে উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে বিজয়কৃষ্ণ যুগের যে সাধনা, সেই সাধনার সাহিত্যিক রূপ ও সুর। আমরা দেখিয়াছি মালঞ্চে "জীবনের অর্দ্ধ আলো অর্দ্ধ অন্ধকারের মধ্যে সমস্যা-সঙ্কুল সন্দেহের আবর্ত্তে পড়িয়া, কবির "সহস্র সঙ্কল্পভরা তরুণ জীবন", আশা প্রেম ও হৃদয়ের রক্ত দিয়া আগ্রহভরে রচিত "সুবর্ণ স্বপনের" রঞ্জিত যবনিকাখানি টানিয়া এক নির্ম্মম বেদনাবহ বিচিত্র অনুভূতিতে ভরিয়া উঠিল। দেখিয়াছি তিনি কেমন অভিমানক্ষুব্ধ হইয়া নিরীশ্বর বাদের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিলেন। অন্ধ সংস্কারের দাসত্বশৃঙ্খল ছিন্ন করিবার নির্ভীক তেজস্বিতা কবির আসিয়া দেখা দিল, তখনই হয়তো অজ্ঞাতসারেই বাঙ্গালীর স্বভাবধর্ম্মের অন্তর্মুখীন সাধনার বার্ত্তা কবির অনুভূতিতে ধরা দিয়াছিল। এই অনুভূতির আভাস

"মালা"তে দেখা দিলেও সম্যক্ ফুটে নাই। তাই "মনোমার্গের পথিক" হইয়া পথে ভাসিতে ভাসিতে ঈপ্সিত স্থান পাইবামাত্র ভাবানন্দে বিহ্বল কবি গাহিয়া উঠিলেন—

"বাজারে বাজারে তবে বাজা জয়ডঙ্কা !
নাহি লাজ নাহি ভয়, নাহি কোন শঙ্কা !
পরাণখানি কাঁপ্‌ছে কত জয়মাল্য গলে.
ফুলের মত কি জানিগো ফুট্‌ছে হৃদিতলে !
সুখের মত দুঃখ আজ, দুখের মত সুখ !
কোন্ গানের গরবে গো ভরিয়াছে বুক ?
প্রাণের মাঝে একি শুনি ? কি নীরব ভাষা !
বুকের মাঝে কোন্ পাখীগো বাঁধিয়াছে বাসা !
পায়ের তলে রাজে পথ ! প্রাণ আজিকে রাজা !
বাজারে বাজারে তবে জয়ডঙ্কা বাজা !"

"অন্তর্য্যামী"র সুর বৈষ্ণব কবিদিগের সুরের অনুকারী, অথচ বর্ত্তমানকালের অভাব, অভিযোগ ও আকাঙ্ক্ষার দ্যোতনা, সাধনার ঐকান্তিকতা ও ভাষার সারল্য ইহাতে বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহাতে আছে প্রাচীন বৈষ্ণবদিগের গভীর তন্ময়তা, সাধকের অব্যভিচারিণী নিষ্ঠা। ইহাতে সেই বৈষ্ণব যুগের আকুল সুর বাজিয়াছে—

"এস মনোবনবাসে ! এস বনমালী !
চরণতলে ফোটা ফুল, তারি বরণ ডালি

সাজায়ে রেখেছি আজ নয়ন-জলে ধুয়ে !
পরাণ ভ'রে প্রাণ জুড়াব তোমার পায়ে থুয়ে !
তোমার পায়ে ফোটা ফুল কাঁটা নাহি তায় !
কত না আনন্দে মোর হৃদয়ে লুটায় !
এস মনোব্রজ বাসে এস বনমালী
তোমার ফুলে সাজায়েছি, তোমার বরণ ডালি !"

চিত্তরঞ্জনের যে সুর "অন্তর্য্যামী"তে ফুটিয়াছে, তাহা তাঁহার শেষ কাব্য "কিশোর কিশোরী"তে আর্ট সৃষ্টির দিক হইতে আরও বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়াছে। অন্তর্য্যামীর কবি যে "দুএর" কথা হইতে এক চির কিশোরের রহস্যময় ব্যঞ্জনাপূর্ণ "তিনের কথা"য় আসিয়া পৌছিবেন, অন্তর্য্যামীতে তাহারও পূর্ব্বাভাস চিরকিশোরের কিশোরীর সহিত প্রথম সাক্ষাৎ—

"সাঁঝের আঁধারে—
ধূসর গগন তলে
নব শ্যাম দুর্ব্বাদলে।"

কেমন সে দেখা—

"সেই সে প্রথম বার দেখিনু তোমারে !
অধরে অমল হাস,
আঁখি কোণে লাজ ভাস,
কে ডাকিল ? ছুটে গেনু সাঁঝের আঁধারে!"

প্রথম দেখাতেই যে কিশোরী সেই চিরকিশোরের মন অধিকার করিল

"সে কোন্ কুসুম সম,
ফুটিলে মরমে মম,
অকস্মাৎ একেবারে প্রাণের মাঝারে!
বর্ণে বর্ণে উজলিলে,
গন্ধে গন্ধে ভরি দিলে,
সকল সোহাগ শূন্য হৃদয়-ভাণ্ডারে!"

তারপর কিশোরীর স্নিগ্ধ দুষ্ট হাসি দেখিয়া কিশোরী ভাবিল—এ বুঝি সন্দেহের হাসি। তাই সে বলিয়া উঠিল—

"নহ মিথ্যা সত্য তুমি! সত্য রূপাধার!
সত্যই সেদিন আমি নয়নে হেরিছি,—
সত্যই পরাণ ভরে পরাণে তুলেছি!
অখণ্ড সুন্দর তনু মধুর গম্ভীর,
রূপ রস গন্ধ ভরা আত্মার মন্দির!
এই যে প্রত্যক্ষ মোর প্রাণ মাঝে জাগে
তোমারে বুঝাতে নারি তাই ব্যথা লাগে
কেমনে বুঝাব তোমা; ওগো বক্ষবাসি,
আমি সে মুরতি-স্রোতে দিবানিশি ভাসি।"

কিশোর কিশোরীর সহিত কিশোরের স্ফুটনোন্মুখ প্রাণ মিশিয়া তিনের কথা রচিয়াছে—তাই অবুঝ প্রাণকে কিশোর সান্ত্বনা দিতেছে—

"তুমিও হেরিতে প্রাণ! আমি হেরি যদি!
চিত্ত-মাঝে রবে বাঁধা নিত্য নিরবধি!

দেখিব দেখাবো তোরে মরমে মরমে
জীবন-মরণ ভ'রে—জনমে জনমে।"

তারপর মিলনের দিনে কিশোরের তৃপ্তিভরা প্রাণের কথা—

"জীবন সাধন ধন তুমি যে আমার
কত জন্ম পরে তাই হেরিনু আবার,
এমন মধুর ক'রে
এমন পরাণ ভ'রে !
কোন দিন হেরি নাই
পাই নাই কোন দিন ;
তুমি যে মধুর মধু মাধুরী আমার !
এমন হারাণ ধন পেয়েছি আবার !"

এই যে চির পাওয়া না পাওয়ার মধ্যে শেষকালে কিশোর কিশোরীর অপূর্ব্ব মিলন এক নূতন সুরের সৃষ্টি করিয়াছে, ইহাতে কবি অচিন্ত্য ভেদাভেদ বাদ মূলক সাধক জীবনের এক বৈচিত্র্য ও রহস্যময় ধর্ম্মজীবনের অভিজ্ঞতাকে প্রাচীন পদকর্ত্তাগণের অকুণ্ঠ আবেগ ও ভাষার অনাবিলতার মধ্যে সুস্পষ্টরূপে কাব্যের রূপান্তরে পৌছাইয়া দিয়াছেন। অকৃত্রিম আবেগ, ধর্ম্মের জটিল রহস্যময় অভিজ্ঞতাকে কি করিয়া সহজ ও সরলভাবে প্রাণের কথায় মর্ম্মস্পর্শী করিয়া বলা যায়, অন্তর্য্যামী ও ও "কিশোর কিশোরী" তাহার এক নূতন পরিচয়।

চিত্তরঞ্জনের কাব্যবিশ্লেষণ করিতে গিয়া আমরা দেখিয়াছি উহা বৈষ্ণব আদর্শে অনেকটা গঠিত, বৈষ্ণব ভাবে উহা ভরপুর।

এই বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রভাব বিস্তার করিবার উদ্দেশ্যে এবং সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালা সাহিত্যকে একটা নূতন রূপ দিবার জন্য চিত্তরঞ্জন ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে "নারায়ণ" নামক বিখ্যাত মাসিক পত্রিকার প্রবর্ত্তন করেন। ইহার নিয়মিত লেখকগণের মধ্যে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শ্রীযুত বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ বিখ্যাত সাহিত্যিক-গণের নাম দেখিতে পাই। ১৩২১ ফাল্গুনের নারায়ণে তিনি বাঙ্গালা কবিতার প্রাণের কথা বলিয়াছেন, চণ্ডীদাস হইতে কৃষ্ণকমল গোস্বামী পর্য্যন্ত এই কবিতার একটা অক্ষুন্ন ধারা বহিতেছে তাহার কথাই তিনি বলিয়াছেন—

"আমাদের প্রত্যেক প্রত্যক্ষের প্রত্যেক ভাবের, প্রত্যেক সম্বন্ধের একটা অন্তঃপ্রকৃতি আছে। সকল বহিরাবরণের মধ্যে এই অন্তঃপ্রকৃতির অনুসন্ধানই মনুষ্যজীবন। সকলেই সেই একই অনুসন্ধান করিতেছে। আমরা সকলেই সেই অন্তঃপ্রকৃতির সেই প্রাণের খোঁজে ব্যস্ত হইয়া ঘুরিয়া বেড়াই। যাহাকে জীবনের অনন্তমুহূর্ত্ত বলি, সেই অনন্তমুহূর্ত্তে সেই প্রাণেরই সাক্ষাৎলাভ হয়। আর সেই মুহূর্ত্তেই আমাদের হৃদয় মন রসোচ্ছ্বাসে অধীর হইয়া পড়ে। তখনই কবিতার সৃষ্টি হয়। এই যে অপূর্ব্ব মিলন—জীবন তাহার মহামন্দির। ইহাই কবিতার রাজ্য। এ মিলন মন্দির সত্য। সত্যকে ছাড়িয়া দিলে কোন কবিতাই সম্ভব হয় না। সে মন্দিরে যে সঙ্গীত-স্রোত চিরকাল প্রবাহিত হইতেছে, তাহাতে অবগাহন করা চাই।"

বাঙ্গালার সাহিত্যিকগণ ১৯১৭ সালের বার্ষিক বঙ্গীয় সম্মিলনে

বাঁকিপুরের অধিবেশনে চিত্তরঞ্জনকে সাহিত্য শাখার সভাপতি পদে বরণ করিয়াছিলেন। পরবৎসর ঢাকা নগরীতে সাহিত্য সম্মিলনের বার্ষিক অধিবেশনে তিনি অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নিযুক্ত হন। বাঁকিপুরের অধিবেশনে চিত্তরঞ্জন "বাঙ্গালার গীতি-কবিতা" সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধেও তিনি বৈষ্ণব কবিতাকে বাঙ্গালার প্রাণের অভিব্যক্তি বলিয়াছেন। একস্থানে তিনি বলিতেছেন—

"কেহ কেহ বলেন বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যরূপক। মানুষের নিজের অর্থাৎ বৈষ্ণবকবিগণের নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা ও সত্যের উপরে নাকি তাহার প্রতিষ্ঠা নহে। কোন্‌টা সত্য, কোন্‌টা মিথ্যা, তাহাকে কল্পনা করিয়া লইয়া ও ইউরোপীয় সাহিত্যের অভিজ্ঞতাকে সেই কল্পনার সাহায্যে আপনার অভিজ্ঞতা মনে করিয়া লইয়া সেই অভিজ্ঞতা দিয়া বৈষ্ণব সাহিত্য ও বৈষ্ণব কবিতা বুঝিতে গেলে, বোধ হয়. রূপকের আবশ্যক হয়। কিন্তু বৈষ্ণব কবিদিগের প্রত্যেক অনুভূতি যে তাঁহাদের হৃদয় ও প্রাণের পরিপূর্ণ অভিজ্ঞতার উপরেই স্বাধিষ্ঠিত। বৈষ্ণব কবিতার মধ্যে প্রাণের সাড়া পাই। বৈষ্ণবকবিদিগের শ্রীকৃষ্ণ কাল্পনিক নহে। বৈষ্ণবের রাধা, তাঁহাদের জীবনের প্রাণের মর্ম্মের শতদলের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। এই যুগল সভ্যতা, সাধনা, শিক্ষা, দীক্ষার মধ্যে শত শত বিচিত্ররূপে প্রকাশিত করিয়াছে।" প্রাণের মণিকোঠায় ধরে রাখা রূপ যখন কবিতার মধ্যে প্রকাশ হয়, তখনকার সে কথা

"আঁখির নিমিখে পলকে পলকে
কতবার হই হারা।
শুনহ কানাই আর কেহ নাই
কেবল নয়ন তারা।"

চণ্ডীদাসের এই কবিতাই বৈষ্ণবকবিদের ভাবমাধুর্য্যের আদর্শ।

"রূপান্তরের কথা" শীর্ষক আর একটি প্রবন্ধে চিত্তরঞ্জন এই রূপেরই বিকাশের কথা বলিয়াছেন। ইহার একস্থানে তিনি বলিতেছেন—

"রূপে ধরা দিবার জন্যই ভাব প্রাণের অন্তরে অন্তরে গুমরিয় উঠে। ভাব যতই রূপের ভিতর দিয়া স্ফূর্ত্তি পাইতে থাকে, ততই তাহার সৌন্দর্য্য বাড়ে। ভাব যখন সত্য সত্যই রূপের কাছে ধরা দেয়, তখনই তাহা মধুর ও সুন্দর। সত্য যখন মানব মনে প্রতিভাত হয়, ভাব যখন সেই আকারে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে, তখন সে ভাব কাল্পনিক নহে, সত্যের অবভাস নয়, তাহা সত্যরূপ, তাহাই সত্যরূপ। সত্যের রাজ্যে নিত্য যে লীলা চলিয়াছে, তাহাতে ভাব ও আকারের পার্থক্য নাই। সে লীলা কাব্য লোকের নিভৃত মিলনকেন্দ্র।" চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব-কবিদিগের জীবনে এই রূপান্তর হইয়াছিল, তাঁহারা ভাবের মিলনমন্দিরে প্রবেশ করিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহাদের সৃষ্টিই উহার প্রমাণ।

চিত্তরঞ্জনের সমস্ত জীবন যে বৈষ্ণবকবিদিগের ভাবাতিশয্যে

ভরপুর এবং তাঁহার দেশপ্রেমিকতাও যে এই বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রীতি হইতে ফুটিয়া উঠিয়াছে ইহার আভাস দিবার জন্যই তাঁহার কাব্য বিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণবকবিতা সম্বন্ধে এত কথা বলিতে হইল।

তৃতীয় অধ্যায়



পারিবারিক জীবন, ধর্ম্মমত ও সমাজ সংস্কারের চেষ্টা।



মানুষের মনের সৌন্দর্য্য সর্ব্বপ্রথম বিকাশ পায় তাহার পারিবারিক জীবনে। সেই সৌন্দর্য্যের স্পর্শে তাহার হৃৎ-শতদলে যে নব নব রূপ ফুটিয়া উঠে, সেগুলিই তাহার জীবনে বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য আনিয়া দেয়। চিত্তরঞ্জনের পারিবারিক জীবনে অনেক কঠোর পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে, তাহার সবগুলিই তিনি কাটাইয়া উঠিয়াছেন, তবে সময়ে সময় উহারা তাঁহার হৃদয়ে একটা দাগ রাখিয়া গিয়াছে। চিত্তরঞ্জন পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র, সুতরাং পিতার অসুস্থতায় ভ্রাতা ভগিনীদিগের শিক্ষা ও ভরণপোষণের ভার তাঁহার উপরই পড়িয়াছিল। চিত্তরঞ্জন অম্লান বদনে এই কর্ত্তব্যের

ভার মাথায় পাতিয়া লন এবং ভ্রাতা ভগিনীগণের উত্তম শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া, সৎপাত্রে ভগিনীদিগের বিবাহ দান করিয়া সে কর্ত্তব্য যথাযথ পালন করিয়া আসিয়াছেন। চিত্তরঞ্জনের দুই সহোদর ও পাঁচ ভগিনী ছিল। সহোদর দুইটিকেও বিলাত হইতে ব্যারিষ্টার করিয়া আনিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সহোদর ও সহোদরাদিগের সম্পর্কে তাঁহাকে অনেক শোক পাইতে হইয়াছে। জ্যেষ্ঠা ভগিনী এক পুত্র ও কয়েকটি কন্যা লইয়া অল্প বয়সে বিধবা হইয়াছিলেন, তাঁহার পুত্রকন্যাদের দেখা শুনার ভারও চিত্তরঞ্জনকে লইতে হইয়াছিল। আর একটি ভগিনীও অকালে রোগে ভুগিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। সর্ব্বকনিষ্ঠ সহোদর বসন্তরঞ্জনও ব্যারিষ্টারিতে নাম করিয়া উঠিতেছিলেন, তিনিও অল্প বয়সে বৃদ্ধ পিতামাতাকে ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে শোকে ভাসাইয়া চলিয়া যান। চিত্তরঞ্জনের একমাত্র জীবিত সহোদর প্রফুল্লরঞ্জন দাশ এখন পাটনা হাইকোর্টের বিচারপতি। ইংরাজি সাহিত্যে তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি, তাঁহার রচিত ইংরাজি কবিতা ইংরাজ সমালোচকদিগেরও প্রশংসা পাইয়াছে; ভারতবর্ষীয় ইংরাজকবিতা লেখকদিগের মধ্যে তাঁহাকে উচ্চ স্থানই দেওয়া হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞা অমলা দাশগুপ্তা তাঁহার সহোদরা ছিলেন। সে দিন পর্য্যন্ত কলিকাতা কংগ্রেসে বন্দেমাতরং গীতটি গাহিয়া শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে একটা নূতন ভাবের সৃষ্টি করিয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়া দিয়াছিলেন। তারপর পুরুলিয়ার অনাথ আতুর আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অর্থ সাহায্যে তিনি সেখানে

দেশের দুঃস্থ ও অনাথাদিগের সেবার ভার লইয়াছিলেন। সেই পুণ্য কার্য্য করিতে করিতে তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িলেন এবং অল্পদিন পরেই তাঁহার কর্ম্মময় অবিবাহিত জীবনের শেষ হইল। আবার সেদিন চিত্তরঞ্জনের এক উপযুক্ত ভগিনীপতি সকলের মায়া কাটাইয়া চলিয়া গেলেন। এইরূপ নানা ঘটনায় সংসারে তাঁহাকে অনেক আঘাত পাইতে হইয়াছে। কিন্তু বৈষ্ণবধর্ম্মের উচ্চভাবে অনুপ্রাণিত গীতার আদর্শে গঠিত চিত্তরঞ্জন সব সুখ দুঃখ সেই লীলাময় ঠাকুরটির হাতে সঁপিয়া দিয়া কর্ম্মের মাঝে আপনাকে ডুবাইয়া রাখিয়াছেন।

চিত্তরঞ্জনের মাতাপিতা অনেকদিন ধরিয়া অসুখে ভুগিতেছিলেন, এই সময়ের মধ্যে তাঁহার মনে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রভাব বিশেষ ভাবেই লক্ষিত হইতেছিল। হিন্দুধর্ম্মের উপর আস্থা তাঁহার চিরদিনই ছিল, তবে এই সময়ে তিনি একজন সাত্ত্বিক বৈষ্ণব-ধর্ম্মোপাসক হইয়া উঠিলেন। অনেকে বলেন তাঁহার মাতার মৃত্যুশয্যার উপদেশ সমূহই নাকি তাঁহার ভাবপ্রবণ হৃদয়ে ধর্ম্মের প্রতি এবং হিন্দুর অনুষ্ঠানগুলির উপর একটা গভীর বিশ্বাস ও আন্তরিক নিষ্ঠা জাগাইয়া দিয়াছিল। যাহা হউক মাতার মৃত্যুর পর তিনি হিন্দুধর্ম্মের সকল অনুষ্ঠানই পালন করিয়াছিলেন এবং কয়েকদিন ধরিয়া নিজগৃহে সংকীর্ত্তন ও গীতাপাঠের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। মাতার মৃত্যুর প্রায় ছয় মাস পর চিত্তরঞ্জনের পিতৃবিয়োগ হয়। এত অল্পদিনের মধ্যে পিতৃমাতৃ বিয়োগে চিত্তরঞ্জন বড় শোকসন্তপ্ত হন। যাহা হউক তাঁহার

নবগৃহীত ধর্ম্মভাব তাঁহাকে এই শোকে বিশেষ সান্ত্বনা দিয়াছিল। এই সময়েই তিনি ব্রাহ্মসমাজের দীক্ষিত সভ্যতালিকা হইতে নাম উঠাইয়া লয়েন এবং সম্পূর্ণভাবে হিন্দু হইয়া প্রতিমা অর্চ্চনা আরম্ভ করেন।

এই পারিবারিক শোক দুঃখে চিত্তরঞ্জন সর্ব্বাপেক্ষা শান্তি পাইতেন পত্নী বাসন্তী দেবীর নিকট। হিন্দুধর্ম্মের শাস্ত্রকারগণ সহধর্ম্মিণীর যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন বাসন্তী দেবীতে তাহা সম্পূর্ণভাবে প্রযুজ্য। তিনি শোকে স্বামীর সান্ত্বনাদায়িনী, তাঁহার সাহিত্য-চর্চ্চায় সহযোগিনী, তাঁহার কাব্যের নিরপেক্ষ পাঠক ও সমালোচক এবং সর্ব্বশেষে তাঁহার দেশব্রতে সহকর্ম্মিণী। বাসন্তী দেবীর সাধারণ স্ত্রীলোকের মত সাজসজ্জায় কোন আকর্ষণ নাই, তাঁহার সাদাসিধা পরিচ্ছদের মধ্যে এমন একটা লক্ষ্মীশ্রী ফুটিয়া উঠে যে তাঁহার নিকট আপনিই শ্রদ্ধায় মস্তক নত হইয়া আসে। মোট কথায় তিনি একজন আদর্শ হিন্দু গৃহিণী। তাঁহার মুখে সকল সময়েই একটা প্রশান্ত ভাব, চক্ষে পুণ্যের একটা বৈদ্যুতিক আভা। তাঁহার নিকট রূঢ় কথা কেহ কখনও শুনে নাই। তাঁহার দেবর ও ননদিনীরা তাঁহাকে মাতৃতুল্যা জ্ঞান করেন এবং খুব সম্ভ্রমের চক্ষে দেখেন। তাঁহার ব্যবহারে তাঁহাকে ভয় না করিয়া শুধু জ্যেষ্ঠা ভগিনীর মত ভালবাসিতেই শিক্ষা দেয়। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারিণী আধুনিক শিক্ষায় সুশিক্ষিতা মহিলা নহেন। অথচ তাঁহার ইংরাজি বাঙ্গালা সাহিত্য জ্ঞান বেশ গভীর, সংস্কৃত সাহিত্যের সহিতও তাঁহার পরিচয় আছে।

স্ত্রীজাতির উন্নতিকল্পে অনেক অনুষ্ঠানের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। তাঁহার সকল সময়েই চেষ্টা লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া কার্য্য করা কিন্তু কেমন করিয়া জানি না ভারতের মহিলাবৃন্দ তাঁহার গুণের কথা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে সাধারণ সমক্ষে টানিয়া আনিয়া এই অন্তরালে থাকার জন্য সাজা দিয়াছিলেন। অর্থাৎ ১৯১৯ সালের নিখিল ভারতীয় মহিলাবৃন্দের বার্ষিক অধিবেশনে অমৃতসহরে তাঁহাকে নেতৃত্বের আসন দিয়া তাঁহার গুণের যেমন আদর করিয়াছিলেন সেইরূপ তাঁহাকে বড় বিপদে ফেলিয়াছিলেন। কারণ বাসন্তী দেবী চিরকালই সাধারণ সমক্ষে বক্তৃতা দিতে হইবে শুনিলে সঙ্কুচিত হইয়া পড়েন। যাহা হউক তিনি দেশের ভগিনীগণের অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না এবং সেখানে একটি সুন্দর বক্তৃতাও দিয়াছিলেন, তাহাতেও তিনি ভারতের গৃহলক্ষীর কথাই বার বার বলিয়াছেন। তাঁহার অভিভাষণের এক স্থানে তিনি বলিতেছেন—"মনে রাখিবেন, আমাদিগের আদর্শ সতী, সাবিত্রী ও সীতা, যদি প্রয়োজন মনে হয় তাহা হইলে বর্ত্তমান কালের উপযোগী করিয়া লইবার জন্য সেই ভারতীয় আদর্শকে সংস্কার করিয়া লউন, কিন্তু সেই ভারতের চিরন্তন আদর্শকে নষ্ট করিতে চেষ্টা করিবেন না।" বাস্তবিকই বাসন্তী দেবী হিন্দুধর্ম্মের উচ্চভাবে অনুপ্রাণিত আদর্শ গৃহিণী, সাধারণ স্ত্রীলোকের মধ্যে সমাজের যে সকল কুসংস্কার জমাট বাঁধিয়া একটা নরক সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে, তাঁহার মধ্যে ইহার লেশও নাই। তিনি প্রখর

বুদ্ধিশালিনী, করুণাময়ী, দানশীলা পরোপকারিণী হিন্দুর আদর্শ গৃহলক্ষ্মী।

চিত্তরঞ্জন খাঁটি হিন্দু। কিন্তু সমাজে আগাছা পরগাছার মত যে সব বাঁধন আসিয়া জুটিয়াছে যাহা মনুষ্যত্বকে জলাঞ্জলি দিতে শিখায়, কৌলীন্যের মোহ আবরণ আনিয়া পরস্পরকে ঘৃণা করিবার সুযোগ দেয় এবং বরপণ ও কুলীন বিদায়ের নামে একটা আসুরিক অত্যাচারে সমাজে ভেদনীতি জাগাইয়া তুলে এবং সঙ্গে সঙ্গে উহাকে মরণের পথে অগ্রসর করিয়া দেয়, এমন বাঁধন তিনি কখনও স্বীকার করেন নাই। চিত্তরঞ্জন শৃঙ্খল কোনও দিন গ্রাহ্য করেন না, সেটা মানুষের দেওয়াই হউক অথবা সমাজের দেওয়াই হউক। তিনি কথায় কথায় একদিন বলিতেছিলেন—"সমাজটা বাস্তবিকই এমন মরা মরেছে যে ইহার একটুও সাড়া পাওয়া যায় না। কত স্নেহলতা অত্যাচারের মুখে আত্মবলিদান করিল, তবু বেটা-বেচা ওয়ালাদের চৈতন্য হইল না। তবুও মেয়ের বাপরা সর্ব্বস্বান্ত হ'য়ে কন্যা পার করিতে পারিলেই বাঁচেন।" বাস্তবিক পাঁটা-বেচা করিয়া ছেলে বেচিতে আজকালকার বাঙ্গালা দেশে কাহারও বাধে না, লোকের দিতেও আপত্তি নাই। পরমদেবতা পতির গৃহে আসিবার পূর্ব্বে বালিকার হয়ত দেখিয়া আসিতে হইবে, সেই পতি দেবতা তাহার পিতার ভিটায় ঘু ঘু চরাইয়া দিয়াছেন। আর নব্য বঙ্গ যুবকরাও যাহাদের দাপটে অন্য সময়ে বসুন্ধরা ফাটে তাহারা সেই সময়ে রামের মত একান্ত বাধ্য সুবোধ বালক হইয়া পড়েন। কন্যার

পিতারাও ত ইহার বিরুদ্ধে কিছু করেন না। যেমন করিয়া হোক কন্যার বিবাহ দিয়া তাহাকে এবং তাহার চৌদ্দপুরুষকে উদ্ধার করিতে হইবে—এই ভ্রান্ত ধারণাই যত অনিষ্টের মূল। কেন কন্যাদিগকে সুশিক্ষিত কর, তাহারা জীবিকার্জ্জনের উপযুক্ত হউক—তারপর বিবাহ হয় ভালই, না হয় কুমারীই থাকিয়া অনাথ আতুরের সেবা করিয়া পবিত্র মাতৃত্বের পরিচয় দিক। ষোল লক্ষ বালবিধবার চক্ষে জল দেখিয়া যে সমাজের পাষাণ হৃদয় গলে না— কুমারীর দুর্ভাগ্যের জন্যে সে সমাজের চক্ষের জলে বাণ ডাকে। এইরূপ সমাজের অনেক অত্যাচারের বিরুদ্ধে চিত্তরঞ্জন আলোচনা করিয়া থাকেন। তবে এ আলোচনা প্রায়ই তাঁহার বন্ধুবান্ধব প্রভৃতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে।

চিত্তরঞ্জন জাতিভেদ মানেন না। তিনি বৈদিক যুগের হিন্দুধর্ম্মকেই আশ্রয় করিয়াছেন। বৈদিক ধর্ম্মের সার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য তিনি বৈদিক পণ্ডিত রাখিয়া বেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনি নিজে ব্রাহ্মণ কন্যা বিবাহ করিয়াছেন। তাঁহার দুই কন্যা এক পুত্র। জ্যেষ্ঠা কন্যাকে তিনি কায়স্থ পাত্রের সহিত বিবাহ দিয়াছেন, পুত্রবধূ আনিয়াছেন পশ্চিম বঙ্গের বৈদ্য সমাজ হইতে। এই দুই বিবাহই তিনি বড় বড় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের ব্যবস্থা লইয়া হিন্দুমতেই দিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ হিন্দুমতে কায়স্থ পাত্রের সহিত দিতে চাহিতেছেন দেখিয়া সমাজে খুব আন্দোলন উপস্থিত হয়। মূর্খ সমাজপতিরাই চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিলেন কারণ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ ইহার

ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহে তিনি ব্রাহ্মণ পুরোহিত পর্য্যন্ত আনিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। এই বিষয় লইয়া পত্নীর সহিত তাঁহার খুব আলোচনা হইত। বিবাহের অল্পদিন মাত্র পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি ব্রাহ্মণ পুরোহিত আনিবেন না স্থির করিয়াছিলেন, কারণ জাতিভেদ যখন তিনি মানেন না তখন ব্রাহ্মণের প্রাধান্যই বা তিনি গ্রাহ্য কেন করিবেন। খুব বড় পণ্ডিত দেখিয়া যে কোন জাতের পুরোহিত দিয়াই ত শুভকার্য্য ভাল ভাবে চলিতে পারে। এই বিষয় লইয়া পত্নীর সহিত একদিন সন্ধ্যাকালে তাঁহার তুমুল তর্ক হইল, পত্নী ব্রাহ্মণ পুরোহিত দিয়া বিবাহ দিবার পক্ষপাতী ছিলেন। অনেকক্ষণ তর্কের পর চিত্তরঞ্জন সেখান হইতে উঠিয়া গেলেন। তারপর অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত স্বামীকে শয্যায় না দেখিয়া বাসন্তী দেবী তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে বাহির হন এবং অনেক অনুসন্ধানের পর তাঁহাকে ছাদে একলা পায়চারি করিতে দেখিতে পান। নিকটে গিয়া দেখিলেন চিত্তরঞ্জন মানসিক উত্তেজনায় কাঁদিতেছেন, ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন আর তাঁহার দুই চক্ষু অশ্রুতে ভরিয়া আসিতেছে। বাসন্তী দেবী স্বামীর নিকট গিয়া বলিলেন—"দেখ, ব্যাপারটা ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখ, তুমি যখন সমাজকে সংস্কার করিতে চাহিতেছ উহাকে ভাঙ্গিতে চাহ না, তখন তোমার ক্রমে ক্রমে উঠা আবশ্যক। এখন যদি একেবারে ব্রাহ্মণ পুরোহিত না লইয়া কন্যার বিবাহ দাও, তবে তোমার সংস্কার তোমার আদর্শ কেহ মানিয়া লইবে না। আর এখন

যদি তুমি শুধু জাতিভেদটাই না মানিয়া কন্যার বিবাহ দাও, তবে অনেকে হয়ত তোমার আদর্শ গ্রাহ্য করিতে পারে এবং তোমার উদ্দেশ্যও সফল হইবে। সেই জন্য এখন তোমার ব্রাহ্মণ পুরোহিত আনাই উচিত।" এই কথা শুনিয়া চিত্তরঞ্জন যেন একটা স্বপ্ন হইতে জাগিয়া উঠিলেন এবং উচ্ছ্বাসভরে বলিয়া উঠিলেন—"ওঃ, তুমি আমায় কি আলোই দেখাইলে।" যে মানসিক অশান্তি তিনি ভোগ করিতেছিলেন তাহার উপশম হইল। কন্যার বিবাহের ব্যবস্থাও সুস্থির হইল। তারপর তাঁহার পুত্রের বিবাহও ঐরূপ ব্রাহ্মণ পুরোহিতের দ্বারাই হইয়াছিল। এইরূপে অনেক অশান্তির সময় চিত্তরঞ্জন তাঁহার পত্নীর নিকট হইতে বন্ধুর মত উপদেশ ও সান্ত্বনা পাইয়াছেন। চিত্তরঞ্জনের জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহে খুব বড় বড় পণ্ডিত যোগদান করিয়াছিলেন—তন্মধ্যে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এবং কাশী হইতে আসিয়াছিলেন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত কবিসম্রাট্ যাদবেশ্বর তর্করত্ন। ইহা কিন্তু পেটেল বিলের আন্দোলনের পূর্ব্বে হইয়াছিল।

বাল্যকাল হইতেই চিত্তরঞ্জন এইরূপ স্বাধীনচেতা ছিলেন। তাঁহার স্বাধীন ইচ্ছার উপর কেহ হস্তক্ষেপ করে ইহা তিনি কোন দিনই সহ্য করিতে পারিতেন না। তাঁহার ব্যবসায়ী জীবনেও তিনি চিরকাল নির্ভীকতার পরিচয় প্রদান করিয়া আসিয়াছেন। নোয়াখালিতে এক মোকদ্দমা উপলক্ষে ম্যাজিষ্ট্রেট কারগিল্ সাহেবকে সাক্ষ্য প্রদান করিতে হয়। সাক্ষীর

কাঠগড়ায় দাঁড় না করাইয়া তাহাকে বসিবার জন্য আদালত হইতে পৃথক আসন দেওয়া হয়। চিত্তরঞ্জন যখন সাহেবকে জেরার উপর জেরা করিতে থাকেন, তখন ম্যাজিষ্ট্রেট একটু উষ্ণ হইয়া উঠেন। তিনি চিত্তরঞ্জনকে অপমান করার উদ্দেশ্যেই "বাবু" বলিয়া সম্বোধন করেন। বারুদ স্তূপে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ পড়িলে যেরূপ গর্জ্জিয়া উঠে, চিত্তরঞ্জনও সেইরূপ গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিলেন—"মিষ্টার কার্গিল, তুমি জান ভদ্রতার খাতিরেই, তোমাকে বসিতে আসন দেওয়া হইয়াছে—নতুবা এই মুহূর্ত্তে তোমাকে আমি সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাইতে পারি! আশা করি তোমার প্রতি যতটুকু ভদ্রতা দেখান হইয়াছে, তুমিও সেইটুকু দেখাইতে কুণ্ঠিত হইবে না।" চিত্তরঞ্জন কোনও দিন অন্যায় অপমান সহ্য করিবার লোক ছিলেন না। বিচার আসনে বসিয়া বিচারপতিগণ যখন যে অন্যায় আদেশ করিয়াছেন, নির্ভীক চিত্তরঞ্জন চিরদিনই সেই অন্যায় আদেশের প্রতিবাদ করিয়া আসিয়াছেন। যেখানে কোন প্রতিবিধান না পাইয়াছেন, সে বিচারালয় তিনি পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন। ঢাকার রাজবিদ্রোহের মোকদ্দমায় এইরূপ অন্যায়ের প্রতিবাদ করিয়াই তিনি আদালত গৃহ ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন। যাঁহারা জীবনে কখনও ন্যায় বিরুদ্ধ কার্য্য করেন না, তাঁহারা কোন মতেই অন্যের অন্যায় সহ্য করিতে পারেন না। চিত্তরঞ্জনের ধর্ম্মমত ও সমাজসংস্কার চেষ্টার মূলে এইরূপ একটা অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ভাবই লক্ষিত হয়; অন্যায় তিনি কখনও মানিয়া লইবেন না সেটা লোকের দেওয়াই হউক বা সমাজের গড়াই হউক।

—o—

চতুর্থ অধ্যায়



পরপোকারিতা ও দানশীলতা



আমাদের দেশে একটা কথা আছে—বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। বীর যে সেই পৃথিবীটাকে ভোগ করিয়া যাইতে পারে। বীর অর্থে এখানে যুদ্ধকুশলী অস্ত্রবিশারদ নয়, বীরের অর্থ এখানে ত্যাগবীর, কর্ম্মবীর, জ্ঞানবীর প্রভৃতি এবং ভোগ অর্থে শুধু সঞ্চয় বা স্বকাম চরিতার্থতা নয় বরং ত্যাগ ও পরার্থপরতার দ্বারাই জীবনের ভোগ হইয়া থাকে। প্রাচীন কালে কর্ণই ছিলেন এইরূপ বীরের আদর্শ। ত্যাগেই ছিল জীবনের যথার্থ ভোগ। যে দেশে সেদিনও রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, বিজয়কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়া নির্লিপ্ত কর্ম্ম সন্ন্যাসের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়া গেলেন, সে দেশে জীবনের চরিতার্থতা কোথায় তাহা আর বুঝাইয়া দিতে হয় না।

চিত্তরঞ্জনও তাঁহার ব্যবসায় প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বীরের মত ভোগ করিয়াছেন এবং বীরের মত দুহাতে দান করিয়া বেড়াইয়াছেন। তাঁহার উপার্জ্জনই ছিল ত্যাগের জন্য। দিলীপের চরিত্র বিশ্লেষণ করিতে গিয়া মহাকবি কালিদাস ভারতবর্ষে জীবনের আদর্শ আঁকিয়াছেন—"ত্যাগায় সংভৃতার্থানাং সত্যায় মিতভাষিণাম্। যশসে বিজিগীষণাং প্রজায়ৈ গৃহমেধিনাম্ ॥"

ত্যাগের জন্য ছিল সঞ্চয়, সত্যের জন্য ছিল মিতভাষিতা, যশের জন্য ছিল জয়েচ্ছা, প্রজার জন্য ছিল গৃহী হওয়া। এই যে ত্যাগার্থে সঞ্চয়, ইহাই যেন চিত্তরঞ্জনের জীবনের মূলমন্ত্র। তাঁহার হৃদয় সত্যই বড় কোমল। দুঃখীর দুঃখ দেখিলে তাঁহার হৃদয়ে যেন করুণার গঙ্গা বহিতে থাকে, তিনি কি দিয়া সে দুঃখ দূর করিবেন তাহা ভাবিয়া পান না! কত শত সহায় সম্পদবিহীন নিরন্নের অন্নদান তিনি করিয়া আসিয়াছেন, কত শত বালকের অন্ন বস্ত্র সংস্থান করিয়া অধ্যয়নের সুবিধা করিয়া দিয়াছেন, কত অনাথ অনাথা তাঁহার নিকট তাহাদের দুরবস্থা জানাইয়া অভাব মুক্ত হইয়া কৃতার্থ মনে ফিরিয়া আসিয়াছে, তাহার হিসাবও কেহ রাখে নাই। ধর্ম্মপ্রাণ, নিষ্কামকর্ম্মী, ত্যাগবীর চিত্তরঞ্জন দরিদ্র নারায়ণের সেবার ভার লইয়া যে আনন্দ পাইয়াছেন বোধ হয় আত্মতৃপ্তি সাধনে মানুষ তেমন আনন্দ পায় না। কারণ আমাদের শাস্ত্রে বলে যে দান গ্রহণ করে সে যতটা আনন্দ অনুভব করে প্রকৃত দাতা তাহার অপেক্ষা অনেক অধিক তৃপ্তি পাইয়া থাকেন। সে তৃপ্তি বোধ হয় জীবনের সার্থকতার তৃপ্তি।

চিত্তরঞ্জন যে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন, তাহা অনেকটা ঠাকুরমার ঝুলির মায়াপুরীর ঐশ্বর্য্য বলিয়া মনে হয়। গত তিন বৎসরে তাঁহার মাসিক আয় নাকি গড়ে পঞ্চাশ হাজারের কাছাকাছি ছিল। কেহ কেহ বলেন ভারতবর্ষের কোনও ব্যবহারজীব কোন কালে এত অধিক অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারেন নাই। এই তিন বৎসর যদি তিনি সম্পূর্ণরূপে নিজের

ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিতেন, তবে তাঁহার আয়ের পরিমাণ যে আরও অনেক বর্দ্ধিত হইত, ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার মধ্যেই তিনি আবার পঞ্জাব প্রদেশের অশান্তির কারণ নির্দ্দেশ করিবার জন্য যে কমিটি বসিয়াছিল তাহার কার্য্যে অক্লান্ত পরিশ্রমে প্রায় চারি মাস কাল পর্য্যন্ত নিযুক্ত ছিলেন। ইহা ভিন্ন রাজনীতিক মোকদ্দমা গুলি তিনি কোনোরূপ অর্থ গ্রহণ না করিয়াই চালাইতেন। প্রকৃতপক্ষে আমরা যখন ভাবি যে মাসিক প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা আয়ের ব্যারিষ্টারী পরিত্যাগ করিয়া এক মহাপ্রাণ ব্যক্তি দারিদ্র্যকে স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া নিয়াছেন, তখন আপনিই আমাদের মস্তক নত হইয়া আইসে! তিনি অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন, কিন্তু এরূপ মুক্তহস্তে তিনি দান করিয়া আসিয়াছেন যে অতি সামান্যই তিনি সঞ্চয় করিতে পারিয়াছেন। তাই যখন জীবনের মধ্যাহ্নকালে দেশ জননী তাঁহাকে আপনার সেবার অধিকারী করিয়া আপনার কাছে ডাকিয়া নিয়াছেন, তখন তিনি মায়ের চরণের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন রিক্তহস্ত সন্ন্যাসীর মত। ভবিষ্যতের জন্য সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া তিনি এই কার্য্যে অবতীর্ণ হন নাই, কারণ ব্যবসায় ত্যাগ করিলে তাঁহার আয় অতি সামান্য। তাই আজ চিত্তরঞ্জন যাদের উন্নতির জন্য সর্ব্বত্যাগী হইয়াছেন, সেই তাঁর দেশবাসিদের সঙ্গে এক পর্য্যায়েই আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

বাস্তবিকই অর্থের প্রতি তাঁহার কোন দিনই আকর্ষণ ছিল না। তিনি যাহা উপার্জ্জন করিয়াছেন, নিজের জন্য তাহা সঞ্চয়

করিলে আজ তিনি তাঁহার সমব্যবসায়ী অনেকের মত বাঙ্গালা দেশের একজন প্রধান ধনী ভূস্বামী হইতে পারিতেন। কিন্তু আর্ত্তের জন্য যাঁহার প্রাণ কাঁদে, তাঁহার যে দারিদ্র্যবরণ ছাড়া গতি নাই। এখনও যে তিনি সর্ব্বার্থত্যাগ করিয়া দেশের জন্য ভিক্ষার ঝুলি লইয়াছেন, তথাপি প্রার্থী দরিদ্র তাঁহার দ্বার হইতে রিক্ত হস্তে ফিরিয়া আসে না। আজ আমাদের ছেলেবেলায় শোনা একটা গল্প মনে পড়ে, শুনিয়াছিলাম একজন নাকি দাতা ভিক্ষুক ছিল, সে সমস্ত দিন ভিক্ষা করিয়া যাহা পাইত তাহা উপবাসী আর এক ভিক্ষুকের ক্রন্দন শুনিলে ব্যথিত হইয়া দিয়া ফেলিত এবং নিজেই উপবাসী থাকিত।

যিশুখ্রীষ্ট তাঁহার শিষ্যদের উপদেশ দিয়াছিলেন—তোমার দক্ষিণ হস্ত যাহা করিবে, বামহস্তকেও তাহা জানিতে দিবে না। চিত্তরঞ্জনের দান সম্বন্ধে খ্রীষ্টের এই উপদেশ বিশেষ ভাবেই প্রযুজ্য। দশরথের গুণের মধ্যে কবি একটী গুণ দিয়াছিলেন—"ত্যাগে শ্লাঘা বিবর্জ্জিত" অর্থাৎ দান করিয়া তিনি কাগজে কাগজে আপনার ঢাক বাজাইতেন না। এই কারণে চিত্তরঞ্জনের অদ্ভুত দানের সকল তত্ত্ব তাঁহার নিকট আত্মীয় ব্যতীত আর কেহই জানেন না। এই দোষ বলুন গুণ বলুন ইহা চিত্তরঞ্জন সম্ভবতঃ তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত দুর্গামোহন দাশ মহাশয়ের আদর্শ হইতে পাইয়াছেন। দুর্গামোহন বাবু কলিকাতা হাইকোর্টের একজন প্রধান উকিল ছিলেন এবং উপার্জ্জন করিয়াছিলেন তিনি যথেষ্ট। কিন্তু তিনি এত দান করিয়া গিয়াছেন যে সত্য সত্য এক

কপর্দ্দকও তিনি রাখিয়া যান নাই। বর্ত্তমান সিটি কলেজ প্রতিষ্ঠানে তিনি প্রচুর অর্থ দিয়াছিলেন, স্ত্রীশিক্ষার জন্য ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয় স্থাপন করিয়াছিলেন, তেলিরবাগ গ্রামে উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন এবং দাতব্য চিকিৎসালয় প্রভৃতি অনেক সদনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন। এইরূপ অনেক সৎকার্য্যে দুর্গামোহন বাবু অতুল ঐশ্বর্য্য দান করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার সংবাদ কয়জন লোকেই বা জানে। চিত্তরঞ্জনের দানও এমনি ধারা। কত আত্মীয় স্বজনের তিনি আর্থিক স্বচ্ছলতা করিয়া দিয়াছেন, কত নিরন্ন গৃহস্থের অন্ন সংস্থান করিতে যত্নবান্ হইয়াছেন এবং কত দরিদ্র ছাত্রের অধ্যয়নের সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনার কথা বলিব। একবার চার পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে একটি দরিদ্র বালক প্রবেশিকা পরীক্ষার ফি দিতে না পারিয়া সকলের কাছে অর্থ ভিক্ষা করিতেছিল, সে ঘুরিতে ঘুরিতে চিত্তরঞ্জনের এক খুল্লতাতের গৃহে উপস্থিত হয়, সেখানকার লোকেরা তাহাকে বাড়ী বাড়ী ভিক্ষা না করিয়া একেবারে, চিত্তরঞ্জনের নিকট যাইতে উপদেশ দেন। বালকটি গিয়া চিত্তরঞ্জনের বাড়ীতে উপস্থিত হইল। চিত্তরঞ্জন অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত মোকদ্দমার কাগজপত্র দেখা ও অন্য পড়াশুনা করেন বলিয়া, প্রাতঃকালে তাঁহার নিদ্রা হইতে উঠিতে বিলম্ব হয়। বালকটি অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিয়া একটি ভৃত্যের নিকট চিত্তরঞ্জনের সংবাদ লইতে চায়, পরিচারক বালকটিকে গ্রাহ্য না করিয়া বলিল,—দেখা হইবে না। বালকটি ক্ষুন্ন মনে আবার

চিত্তরঞ্জনের খুল্লতাতের গৃহে ফিরিয়া আসিয়া সকল কথা বলিল, তখন সেখানকার লোকেরা তাহাকে বলিয়া দিল—"তুমি কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করিও না, চুপ করিয়া উপর হইতে নীচে নামিবার পথে বসিয়া থাকিও, নিদ্রা হইতে উঠিয়া আসিবার মুখে তাঁহাকে সকল কথা বলিবে, তাহা হইলেই তোমার কার্য্যসিদ্ধি হইবে।" বালকটি কথামত ঠিক ঐরূপই করিল এবং সেদিন চিত্তরঞ্জনের সহিত সাক্ষাৎলাভ করিয়া তাহার সকল কথা বলিল। চিত্তরঞ্জন শুনিয়া তাহাকে প্রবেশিকা পরীক্ষার ফি ত দিয়া দিলেনই, আরও পরীক্ষা পর্য্যন্ত তাহার থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। বালকটি স্তম্ভিত হইয়া গেল, সে যাহা আশা করিয়া আসিয়াছিল, তাহা অপেক্ষা অধিক সে লাভ করিল। শুনিয়াছি তারপর সেই বালকটি প্রবেশিকায় উত্তীর্ণ হইলে তাহার কলেজে পড়িবার বন্দোবস্তও চিত্তরঞ্জন করিয়া দিয়াছিলেন। এইরূপ দরিদ্রকে সাহায্য দান তাঁহার গোপনেই হইয়া থাকে, অধিকাংশ লোকেই তাহা জানে না ; তাই তাঁহার উচ্চ হৃদয়ের পরিচায়ক এইরূপ দুই একটি ঘটনা তাঁহার জীবনীতে সন্নিবিষ্ট করিয়া তাঁহার চরিত্র বিশ্লেষণ করিতে চেষ্টা করিব।

শিক্ষাবিস্তার কল্পেও চিত্তরঞ্জনের চেষ্টা অল্প নয়। এখন যে জাতীয় বিদ্যালয়ে তিনি সর্ব্বস্ব দান করিয়াছেন, ইহার অনেক পূর্ব্ব হইতেই তিনি শিক্ষার জন্য অকাতরে অর্থ দিয়া আসিয়াছেন। কলিকাতা ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়ের নূতন গৃহ নির্ম্মাণের সময় তিনি প্রচুর অর্থ দিয়াছেন, বেলগাছিয়ায় মেডিক্যাল কলেজ

প্রতিষ্ঠার কালেও তিনি দানবীর রাসবিহারীর সুযোগ্য অনুকারী হইয়াছিলেন। গ্রামের ইংরাজি বিদ্যালয়ও তাঁহার সাহায্য হইতে বঞ্চিত হয় নাই। বাঙ্গালা ভাষার উন্নতির জন্য যে সাহিত্য সম্মিলনের বর্ষে বর্ষে অধিবেশন হইয়া থাকে তাহাতেও চিত্তরঞ্জন মুক্তহস্তে দান করিয়াছেন! যেখানে যেখানে তিনি বুঝিয়াছেন যে জ্ঞানের উন্নতির চেষ্টা হইতেছে, সেখানেই তিনি অর্থদান করিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

চিরকালই চিত্তরঞ্জনের অনাথ আতুর সেবার দিকে বিশেষ লক্ষ্য। চৈতন্যের আচণ্ডালে কোল দেওয়া প্রেমে মুগ্ধ চিত্তরঞ্জনের প্রাণে যে এ ভাব জাগিবে তাহাতো আর সন্দেহ কি? বহু অর্থ ব্যয়ে তিনি পিতার পুরুলিয়াস্থিত বৃহৎ ভবনে অনাথ আতুর আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, উহার জন্য তাঁহার মাসিক দুই হাজার টাকা ব্যয় হইত। ইহাতে কাজও হইয়াছিল যথেষ্ট। অনেক অনাথা, খঞ্জ, অন্ধ, আতুর সেখানে স্থান পাইয়াছিল। চিত্তরঞ্জনের ভগিনী স্বর্গীয়া অমলা দাশ গুপ্তা সেই আশ্রমের ভার লইয়াছিলেন। নিজ হস্তে তাহাদের মূত্র বিষ্ঠা প্রভৃতি পরিষ্কার করিতেও অমলা দেবীর দ্বিধা ছিল না। ভ্রাতার অর্থ সাহায্যে ও ভগিনীর সেবা শুশ্রূষায় উহার কার্য্য বেশ চলিতেছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কাল ব্যাধি আসিয়া পুণ্যব্রতা ভগিনীকে লইয়া গেল, তত্ত্বাবধানের অভাবে সে আশ্রম উঠিতে বসিল। চিত্তরঞ্জন ক্রমে ক্রমে সেই অনাথ আতুরদের অন্যত্র ব্যবস্থা করিয়া দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। নদীয়ার নিত্যানন্দ আশ্রমে অনেক

অনাথা আশ্রয় পাইল, সেই জন্য চিত্তরঞ্জন নিত্যানন্দ ধামে যে দুই লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার নিকট আত্মীয়েরাও জানিতেন না। কলিকাতা থিওসফিক্যাল হলে একটি বক্তৃতা প্রসঙ্গে পণ্ডিত কুলদাপ্রসাদ মল্লিক ভাগবতরত্ন যিনি নিত্যানন্দ আশ্রমের সম্পাদক তিনিই এই গোপন দানের কথা বলিয়া ফেলিয়াছিলেন। তাহাতে উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দ একেবারে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া যান এবং সেই দানবীরের উদ্দেশে তাঁহাদের হৃদয়ের শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেন। তারপর চিত্তরঞ্জন ভবানীপুর অনাথ আশ্রম স্থাপিত করিয়াছেন, তাহাও তাঁহার অর্থ সাহায্যে দেশের বিশেষ উপকার সাধন করিতেছে।

চিত্তরঞ্জন নিজে কবি ও সাহিত্যিক, এই জন্য তিনি সাহিত্যের মর্য্যাদা বুঝেন এবং সাহিত্যিকের আদর জানেন। তিনি কত দুঃস্থ সাহিত্যসেবী ও কবির দুঃখ দূর করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কত দরিদ্র সাহিত্যিকের তিনি গ্রন্থ প্রচারের সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। এই জন্য বাঙ্গালা সাহিত্য তাঁহার নিকট বিশেষভাবে ঋণী। পণ্ডিতপ্রবর উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন যখন তাঁহার অগাধ বেদবিদ্যার প্রচার করিবার সুবিধা পাইয়া উঠিতেছিলেন না, তখন দেশ-বন্ধু চিত্তরঞ্জনের আশ্রয়ে আসিয়াই তিনি নিজের অভিলাষ পূর্ণ করিতে পারিয়াছিলেন। ঋণের দায়ে অক্রান্ত সাহিত্যসেবী স্বর্গীয় পণ্ডিত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি যখন মনঃকষ্ট পাইতেছিলেন এবং বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ মাসিক পত্র "সাহিত্য" উঠিয়া যাইতে বসিয়াছিল, তখন চিত্তরঞ্জন তাঁহার সাহিত্যিক বন্ধুর

সহায় হইয়া দাঁড়ান এবং "সাহিত্য" পত্রকে ঋণ মুক্ত করিয়া সমগ্র বাঙ্গলা জাতির কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েন। আর সেদিন যখন পূর্ব্ববঙ্গের স্বভাবকবি ৺ গোবিন্দচন্দ্র দাস আজীবন নিদারুণ কষ্ট ভোগ করিয়া দেশের সহানুভূতি পাইতেছিলেন না, পূর্ব্ববঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবি হইয়াও যখন তিনি "ভদ্র" নামধারী অভদ্র লোকের নিকট ঢাকার সাহিত্য সম্মিলনে পর্য্যন্ত প্রবেশাধিকার পান নাই, তখন চিত্তরঞ্জন তাঁহাকে বন্ধু বলিয়া আপনার দুঃখ-জুড়ান বুকের কাছে টানিয়া লইয়াছিলেন। সে সব চিত্র এখনও মনে জাগে। কবি গোবিন্দ দাস দুঃখ জ্বালায় অস্থির হইয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছিলেন—

"ও ভাই বঙ্গবাসী।
আমি মলে তোমরা আমার চিতায় দিবে মঠ।
আজ যে আমি উপোস করি,
না খেয়ে পরাণে মরি
হাহাকারে দিবানিশি
ক্ষুধায় করি ছটফট্!"

লজ্জার কথা বলিব কি এত বড় কবিকেও পূর্ব্ববাঙ্গালা আদর করে নাই, আদর করিয়া একমুঠা ভাত তাঁহার মুখে তুলিয়া দেয় নাই। সেই সময় চিত্তরঞ্জন তাঁহার কবি ভ্রাতাকে আশ্রয় দিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কবি গোবিন্দদাস কৃতজ্ঞতা জানাইয়া চিত্তরঞ্জনকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা পড়িতে পড়িতে কাঁদিতে হয়, বাঙ্গালা দেশের সাহিত্যের ইতিহাসে উহা এক

অমূল্য সামগ্রী। কবি গোবিন্দ দাস প্রাণ ভরিয়া চিত্তরঞ্জনকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে ইহার অল্পদিনের মধ্যেই কবি গোবিন্দদাস মৃত্যুমুখে পতিত হন।

বাঙ্গালা দেশের এই দারিদ্র্য ও স্বাস্থ্যহীনতা চিত্তরঞ্জনের বুকে বড় বাজে। তিনি অনেক সময় নিরাশ হইয়া বলেন—বাঙ্গালা বুঝি আর বাঁচে না। তবে কি বঙ্কিমচন্দ্রের সেই ভবিষ্যৎ বাণী মিথ্যা হইবে। মা যদি ঐ পশ্চিম সমুদ্রের লবণাম্বুরাশির অতল গর্ভেই নিমজ্জিত হইয়া থাকেন, তবে কি আমরা আর মাকে উঠাইতে পারিব না? শস্যশ্যামলা জন্মভূমি—আজ তাহার কোটি কোটি সন্তান এই দীপ্ত চৈত্র মধ্যাহ্নে শুষ্ক কণ্ঠ মরণাতুর। বাঙ্গালী কি সত্য সত্যই আজ একমুঠা ভাতের জন্য ধুঁকিতে ধুঁকিতে মরিয়া যাইবে। বাঙ্গালী আরও অনেকবার মরিয়াছে, কিন্তু এমনি করিয়া মরা বুঝি আর সে কখনও মরে নাই। নারায়ণের একটি প্রবন্ধে তিনি লিখিয়াছিলেন—

"আজ বাঙ্গালীর অনেক ভাবিবার কথা আছে। অনেকে অনেক দিক হইতে বাঙ্গালীর কথা ভাবিতেছেন। কেহ বলিতেছেন ইউনিভার্সিটির শিক্ষা বন্ধ করিয়া দাও। আইন কলেজটাকে একেবারে ভূমিসাৎ করিয়া ফেল। যদি ইংরাজের কাছে কিছু শিখিতেই হয়, তবে বিজ্ঞান শিক্ষা কর; ব্যবসা বাণিজ্যে অগ্রসর হও। কেহ বলিতেছেন, সমগ্র মুসলমান সমাজে যে সাম্যবাদ বিদ্যমান,—হিন্দু সমাজে তেমনই একটা সাম্যবাদ প্রচলিত না হইলে, হিন্দুগণ আর কুড়ি বৎসরের মধ্যেই প্রায়

নির্ম্মূল হইয়া যাইবে। মুসলমান যুগেও হিন্দু ও মুসলমানের সংখ্যা দশ আনা ছয় আনা ছিল। আজ উল্টা দিকে দশ আনা ছয় আনা হইয়াছে। খ্রীষ্টান যুগে লক্ষ লক্ষ হিন্দু মুসলমান হইয়া গেল কেন? এখনও যাইতেছে কেন? যাহারা মুসলমান হইয়াছে ও হইতেছে, তাহারা কি সকলেই হিন্দু ছিল না, এই কথাই বলা হয়, তবে মুসলমানগণ তাহাদিগকে টানিয়া লইলেন,—হিন্দুরা তাহাদিগকে টানিয়া লইল না কেন? এতদিন লয় নাই কেন? ইহা কি হিন্দুদিগের করা সঙ্গত ছিল না? হিন্দুর কাজ হিন্দুকেই করিতে হইবে,—সেজন্য যাহারা "হিন্দু নই বলিতে প্রস্তুত" তাহাদের উপর নির্ভর করিলে ত চলিবে না।

* * * *

"তারপর অন্নসমস্যা। সকল সমস্যার বড় সমস্যা। সকল প্রকার বীভৎস সামাজিক বিপ্লবের মূলীভূত কারণ এই অন্নসমস্যা। বাঙ্গলার বিশেষতঃ পূর্ব্ব বাঙ্গলার একটা বড় ব্যবসা—পাট। পাটের দাম অভাবনীয় রূপে নামিয়া গিয়াছে। বাঙ্গালী পাট ব্যবসায়ী মহাজনগণ এবার সর্ব্বস্বান্ত, সম্ভবতঃ আগামী বৎসর একেবারে রিক্তহস্তে তাহারা বিশ্বের পথে চিরমুক্ত হইবে। স্থানীয় মিলের মালেক সাহেব। সাহেবেরা বাঙ্গালীর হাতে পাট খরিদ করা বন্ধ করিয়াছেন। বাঙ্গালী পাটের মহাজন একে মূর্খ—তাহাতে যৌথকারবার বিমুখ। কাজেই প্রাকৃতিক নিয়মে তাহারা ঝড়ের মুখে শুষ্ক তৃণের মত উচ্ছন্নের আকাশে উড্ডীয়মান। পাটের ব্যবসার ক্ষতিতে পূর্ব্ববাঙ্গালার এক ধনাঢ্য বণিক সম্প্রদায়

মরণোন্মুখ। পূর্ব্ববাঙ্গালার কৃষক অন্নহীন,বস্ত্রহীন—পথের ভিখারী। পৃথিবীর এত বড় একটা একচেটিয়া ব্যবসা এতকাল যাহাদের হাতে ছিল, তাহারা কত বড় মূর্খ হইলে আজ এমনই করিয়া দেশকে ডুবাইয়া নিজেরা ডুবিতে পারে? কেহ বলিতেছেন আমাদের দেশের মাটীতে পাট জন্মে, আমরা যদি পাট না বেচি, সাহেবেরা কোথায় পাট পাইবেন, আমরা সাহেবদের পাট বেচিব না। কিন্তু সর্ব্বশেষে দাঁড়ায় এই—বিড়ালের গলায় কে ঘণ্টা বাঁধিতে যাইবে? আবার কেহ বলেন,—এবারে বীজের জন্য যত পাটের বীচি আছে,—এস, সকলে মিলিয়া তাহা কিনিয়া পুড়াইয়া ফেলি আগামী বৎসর আর পাটের চাষ হইতে পারিবে না। কাজেই সাহেবেরা আমাদের এই পাট বাধ্য হইয়া কিনিবেন। কেহ বলিতেছেন—চল, জমীদারের শরণাপন্ন হই। তাঁহারা প্রজাদের ডাকিয়া বলিয়া দিন যে, আগামী বৎসর কৃষক আর পাটের চাষ না করে। * * * *

ইহা সকলই বাঙ্গালীর ভাবিবার কথা। তাই যুগসন্ধিক্ষণে বাঙ্গালার বিভিন্ন অবস্থান স্তরে অবস্থিত হিন্দু ও মুসলমান সকল বাঙ্গালীকেই আমরা বলিতেছি,—উঠ,—জাগ—জাগাও, সন্ধিপূজার আর দেরী নাই।”

চিত্তরঞ্জনের প্রাণে যে সব চেয়ে দেশের কথাই বেশী জাগিয়া থাকিত, তাহা এমনি ধারা রচনার মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। আসল কথা পল্লীর স্বাস্থ্যোন্নতি পল্লীর শিক্ষার প্রসার, ইহাই অনেককাল ধরিয়া চিত্তরঞ্জনের একমাত্র ধ্যান ধারণার বস্তু ছিল।

বিক্রমপুরের পল্লীগ্রামগুলির উন্নতির জন্য বিক্রমপুর সম্মিলনী নামে একটি সমিতি আছে। চিত্তরঞ্জন ইহার একজন প্রধান উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক। এই সমিতির নানাবিধ উদ্দেশ্য আছে। উহার মধ্যে পল্লীগুলির স্বাস্থ্যোন্নতি ও শিক্ষাবিস্তার এবং দুঃস্থ পল্লীগ্রামবাসিগণকে পরমুখাপেক্ষী না হইয়া নিজের নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইতে সমর্থ করাই বিক্রমপুর সম্মিলনীর প্রধান উদ্দেশ্য। এই সমিতির হস্তে গ্রামের নানাবিধ 'উন্নতির জন্য চিত্তরঞ্জন মাঝে মাঝে বহু অর্থ দান করিয়াছেন। সেদিনও বিক্রমপুরের একটি গ্রামের পুষ্করিণী খননের জন্য তিনি এই সমিতির হস্তে প্রচুর অর্থ দিয়াছেন। তারপর ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে যখন পূর্ব্ববঙ্গে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল, অধিকাংশ গ্রামবাসীর একবেলাও অন্ন জুটিত না, তখন এই বিক্রমপুর সম্মিলনী ইহার যথাসাধ্য সাহায্য পাঠাইয়াছিল। পূর্ব্ববঙ্গের যুবকেরা যখন দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়াছিল, সে সময় তাহারা সর্ব্বাপেক্ষা উৎসাহ পাইয়াছিল শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন ও শ্রীযুত সতীশ রঞ্জনের নিকট। তাঁহাদিগেরই অর্থ সাহায্য ও আশীর্ব্বাদ পাথেয় করিয়া বিক্রমপুর সম্মিলনী কর্ম্মক্ষেত্রে নামিতে সাহস করিয়াছিল। কিন্তু যখন ঐ বৎসরের শেষভাগে পূর্ব্ববঙ্গে বিশাল ঝটিকাবর্ত্ত ও বন্যা বহিয়া শত শত নরনারীকে মৃত্যুর পথে টানিয়া নিয়া পূর্ব্ববঙ্গে একটা মহাশ্মশানের সৃষ্টি করিল, তখন চিত্তরঞ্জন আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তিনি তাঁহার ব্যবসায়ের বহু ক্ষতি স্বীকার করিয়া নিজেই কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। অধিকাংশ

গ্রামবাসীর গৃহ ও কুটীর ভূমিসাৎ হইয়া পড়িয়াছিল, বিষয় সম্পত্তি সকল নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। এই সকল দুঃস্থ পরিবারের সাহায্য কল্পে "বেঙ্গল রিলিফ কমিটি" অর্থাৎ বাঙ্গালা দেশের সাহায্যসমিতি নামে একটি সমিতি গঠিত হয়। চিত্তরঞ্জন এই সাহায্য ভাণ্ডারে নিজে দশ হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন এবং কেশোরাম পোদ্দার প্রভৃতি ধনকুবের মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীদিগের নিকট হইতে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রকন্যাগণও এই সময়ে বাড়ী বাড়ী ভিক্ষা করিয়া বহু অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। চিত্তরঞ্জন এই উপলক্ষে ঢাকা, খুলনা প্রভৃতি বহুস্থানের গ্রামে গ্রামে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়ান। দেশের কাজের জন্য তিনি সে সময়ে পথের বহু অসুবিধাও গ্রাহ্য করেন নাই। গ্রামে গ্রামে গিয়া তিন চারিটি ইউনিয়ন একত্র করিয়া এক একটি কেন্দ্র গঠন করিয়া তাহাদের নিকট অর্থ প্রেরণের ব্যবস্থা করিলেন. এইরূপে গ্রামগুলিতে সুশৃঙ্খল ভাবে গৃহহীন নিরন্ন পল্লীবাসী দিগের লজ্জারক্ষা ও প্রাণরক্ষা হইয়াছিল। আর একটি প্রশংসার যোগ্য কার্য্য ঐ সাহায্য সমিতি করিতে চেষ্টা পাইয়াছিল। নিঃস্ব গ্রামবাসীদের কিছু অর্থ দিয়া তাহাদিগের দ্বারা কুটীর শিল্পের কাজ করাইয়া সহরে সহরে তাহার বিক্রয়ের বন্দোবস্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। ইহার দ্বারা গ্রামবাসী দরিদ্র গৃহস্থদিগকে চিরকাল পরমুখাপেক্ষী না রাখিয়া আত্মনির্ভরশীল করিবার প্রয়াস হইয়াছিল। ইংরাজিতে একটি কবিতা পড়িয়াছিলাম, তাহার ভাবার্থ এই—"আমার নিকট একটি ভিক্ষুক

আসিয়াছিল, আমি তাহাকে অর্থ সাহায্য করিলাম সে চলিয়া গেল; আবার কিন্তু পরদিন সে আসিল, সে দিনও আমি অর্থ সাহায্য করিলাম সে চলিয়া গেল; আবার সে আসিল এবার আমি তাহাকে একটা নূতন ভাব দিলাম, সে আর প্রার্থনা জানাইতে আসিল না, সে সেই নূতন উপদেশের সাহায্যে আত্মনির্ভরশীল হইয়া উঠিল।" এই কবিতাটির অর্থ এই যে মানুষের প্রধান কর্ত্তব্য প্রার্থী দরিদ্রকে আত্মনির্ভরশীল করিয়া তুলা এবং উহাই সর্ব্বাপেক্ষা মহত্তর দান। এইরূপ শ্রেষ্ঠ দানের চেষ্টা চিত্তরঞ্জন অনেকবার করিয়াছেন এবং বহু স্থানে সফলকামও হইয়াছেন।

চিত্তরঞ্জন চিরজীবনই পরদুঃখ কাতর। তাঁহার প্রাণের অন্তরতম কথা তাঁহারই একটি কবিতার স্বচ্ছ দর্পণে সুস্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে—

"অপরের দুঃখ জ্বালা হবে মিটাইতে,
হাসি আবরণ টানি দুঃখ ভুলে যাও,
জীবনের সরবস্ব অশ্রু মুছাইতে
বাসনার স্তর ভাঙ্গি বিশ্বে ঢেলে দাও।
হায় হায় জনমিয়া যদি না ফুটালে
একটি কুসুম কলি নয়ন কিরণে
একটি জীবন ব্যথা যদি না জুড়ালে
বুক ভরা প্রেম ঢেলে বিফল জীবনে।
আপনা রাখিলে ব্যর্থ জীবন-সাধনা
জনম বিশ্বের তরে—পরার্থে কামনা।"

পঞ্চম অধ্যায়



রাজনীতিক জীবন ও স্বদেশ প্রেমিকতা

ইংরাজীতে যাহাকে socialism বলে, চিত্তরঞ্জনের জীবনে তাহারই বিকাশ। Socialism এর বাঙ্গালা অর্থ সামাজিকতা নয় অথবা সমাজসংস্কারেচ্ছাও নয়, উহার অর্থ অনেকটা সমাজপ্রেম অর্থাৎ নিম্নশ্রেণীর দেশবাসীদিগকে শিক্ষার দ্বারা উচ্চশ্রেণীর সমান করিয়া একস্তরে সকলকে আনিয়া ফেলা। যদিও চিত্তরঞ্জনের অন্তরে মাতৃভূমির উজ্জ্বল মূর্ত্তি জাগিয়া থাকিয়া তাঁহাকে এক চিরনবীন কর্ম্মশক্তি আনিয়া দিতেছে, তথাপি তিনি এই "অবারিত মাঠ, দীঘি পথ ঘাট" ঘেরা দেশকে নারায়ণের আধার মূর্ত্তিরূপেই অধিক কল্পনা করিয়া থাকেন। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের বাঙ্গালা প্রাদেশিক সমিতির সভাপতির অভিভাষণে এই রূপই ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন। Socialism এর সহিত দেশের রাজনীতিক আলোচনার কি সম্বন্ধ তাহাই তিনি প্রথমে বুঝাইতে প্রয়াস পান। এক হিসাবে তাঁহার এই অভিভাষণ বাঙ্গালার রাজনীতিক আন্দোলনে একটা নূতন সুর আনিয়া দিয়াছে। তিনি বলিতেছেন—

"প্রথমেই হয়ত অনেকেরই মনে হইবে যে, এই মহাসভা শুধু রাজনীতিক আলোচনার জন্য, এই সভায় বাঙ্গালার কথার আবশ্যকতা কি? এই প্রশ্নই আমাদের ব্যাধির একটি লক্ষণ।

(৬৯)

সমগ্র জীবনটাকে টুকরা টুকরা করিয়া ভাগ করিয়া লওয়া আমাদের শিক্ষা-দীক্ষা ও সাধনের স্বভাব বিরুদ্ধ। * * * * *। আমাদের রাজনীতিক আলোচনা বা আন্দোলনের যে বিষয়, তাহাকে কি বাঙ্গালী জাতির যে জীবন, সেই জীবনের সবদিক দিয়া দেখিতে চেষ্টা করিব না? যদি না দেখি তবে কি সত্যের সন্ধান পাইব? * * * * এই যে রাষ্ট্রীয় চিন্তা বা চেষ্টা, ইহার সার্থকতা কোথায়? এক কথায় বলিতে হইলে বলিতে হয় বাঙ্গালীকে মানুষ করিয়া তোলা। সেই জন্য আমাদের এখন ঠিক কি অবস্থা, তাহার বিচার করিতেই হইবে। সেই বিচার করিতে হইলে, আমাদের আর্থিক অবস্থা কিরূপ, তাহা বিচার করিতে হইবে। সেই বিচার করিতে হইলে, আমাদের চাষাদের চাষের সন্ধান লইতে হইবে। আমাদের চাষের সন্ধান ভাল করিয়া লইতে হইলে, আমাদের চাষ বাড়িতেছে কি কমিতেছে, তাহার খোঁজ রাখিতে হইবে। সেই কারণ অনুসন্ধান করিতে করিতে দেখিতে হইবে, কেন পল্লীগ্রাম ছাড়িয়া, অনেক লোক সহরে আসিয়া বাস করে, সেই কারণ অনুসন্ধান করিতে হইলে বিচার করিতে হইবে যে সে কি পল্লীগ্রামের অস্বাস্থ্যের জন্য, কি অন্য কারণে। ইহাতেই দেখা যাইতেছে যে, রাজনীতির সাধন করিতে হইলে আমাদের চাষাদের অবস্থা চিন্তা করা আবশ্যক এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের গ্রামের অস্বাস্থ্যের কারণ অনুসন্ধান করাও আবশ্যক। সেই সঙ্গে ইহাও বিচার করিতে হইবে, আমাদের দেশে যত চাষযোগ্য জমি আছে,

সব ভাল করিয়া চাষ করিলেও আমাদের অবস্থা স্বচ্ছল হয় কিনা। যদি না হয় তবে ব্যবসা বাণিজ্যের কথা আলোচনা ও বিচার করিতে হইবে।”

কিন্তু আমরা এইরূপ ভাবে দেশের অবস্থা বুঝিতে চেষ্টা করি না কেন? কারণ আমাদের শিক্ষার অভিমান আসিয়া দেশের সাধারণের সহিত যে আমাদের প্রাণের যোগ নষ্ট করিয়া দিয়াছে। তাই তিনি বলিয়াছেন—

“আমরা যে শিক্ষিত বলিয়া অহঙ্কার করি, আমরা দেশের কতটুকু স্থান অধিকার করিয়া থাকি? আমরা কয় জন? দেশের আপামর সাধারণের সঙ্গে আমাদের যোগ কোথায়? আমরা যাহা ভাবি, তাহারা কি তাই ভাবে? সত্য কথা বলিতে হইলে কি স্বীকার করিব না যে, আমাদের উপর আমাদের দেশ বাসীদের সেরূপ আস্থা নাই? আমরা যে তাহাদের ঘৃণা করি। কোন্ কাজে তাহাদের ডাকি? Government এর কাজে কোনও আবেদন করিতে হইলে তাহাদের গায়ে হাত বুলাইয়া একটা বিরাট্ সভার আয়োজন করি, কিন্তু সমস্ত প্রাণ দিয়া কোন্ কাজে তাহাদের ডাকি? আমাদের কোন্ কমিটীতে কোন সমিতিতে চাষা সভ্য শ্রেণীভুক্ত?”

এই ত্রুটির এখন অনেক সংশোধন হইয়াছে, জাতীয় মহা-সমিতিতে ও প্রাদেশিক সমিতিতে দেশের যাহারা প্রাণ তাহাদের স্থান হইয়াছে, কৃষক সভ্য এখন নেহাৎ নগণ্য নয়। কিসে

আমাদের এমন লক্ষ্যভ্রষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিল সভাপতির অভিভাষণে তিনি তাহা স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন—

"আমরা আহারে ব্যবহারে আচারে বিচারে ভাষায় ভাবে ধর্ম্মে কর্ম্মে সমস্ত জীবন ক্ষেত্রে প্রতিপদ ক্ষেপে বিলাতের অনুকরণ করিয়াছি। মন্দিরের বদলে সভা করিয়াছি, সদাব্রতের বদলে হোটেল করিয়াছি, থিয়েটার করিয়া আনন্দের মূল্য দুর্ভিক্ষে দান করি, লটারি করিয়া অনাথ আশ্রমের চাঁদা তুলি; দেশে যত রকমের স্বাস্থ্যরক্ষা করিবার সহজ উপায় ছিল, তাহার বদলে বিলাতি খেলা আমদানী করিয়াছি, অর্থোপার্জ্জন যে আমাদের জীবন-যাপনের উপায় মাত্র তাহা ভুলিয়া গিয়া বিলাতি industrialism এর নকল করিয়া অর্থ উপার্জ্জনের জন্যই জীবনযাপন করিবার চেষ্টা করিতেছি।"

কেন আমাদের এমন হইল? কেন আমরা দেশের সহিত প্রাণের সংযোগ হারাইয়া ফেলিলাম? কারণ আমাদের সকল আদর্শের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা দীক্ষার আদর্শও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। আসল কথা আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষাদীক্ষার প্রণালী সমূলে না বদলাইলে, ইহাকে আমাদের দেশের স্বভাবধর্ম্ম সভ্যতা ও সাধনার সহিত যোগ করিয়া দিতে না পারিলে এবং এই শিক্ষাকে সাধারণের সহজ প্রাপ্য করিয়া তুলিতে না পারিলে, আমাদের ঘোর বিপদের কথা। এই শিক্ষার ফলে আমরা দেশের নিকট হইতে মনে প্রাণে অনেকটা সরিয়া গিয়াছি। এই শিক্ষা সম্বন্ধে চিত্তরঞ্জন বলিতেছেন—

(৭২)

আমাদের হাব-ভাব, আচার ব্যবহার সবই এত ইংরাজীনবীস হইয়াছে যে, হঠাৎ দেখিলে মনে হয়, শিক্ষিত বাঙ্গালীর সঙ্গে বাঙ্গালা দেশের কোন যোগ নাই। এই শিক্ষার ফলে আমরা বস্তুর সঙ্গে পরিচয় লাভ করিয়া তাহার প্রাণের কাছে গিয়া তাহাকে ছুঁইতে পারি নাই, কেবল উপর হইতেই দেখিয়াছি, আর কতকগুলা ইংরাজি শব্দ মুখস্থ করিয়াছি। আমরা মানুষ হইয়া উঠি নাই, একটু চালাক হইয়াছি মাত্র। একটু বিচার করিয়া দেখিলেই দেখা যায় যে, যাহারা ইংরাজি শিক্ষা পায় নাই, যাহাদের তোমরা অশিক্ষিত বলিয়া ঘৃণা কর, তাহাদের দয়ামায়া আছে, ধর্ম্ম আছে, তাহারা মানুষের দুঃখ বোঝে, অতিথি সেবা করে, দেবতাকে ভক্তি করে। আমার মনে হয়, আমাদের এই নবজাগরিত জাতিকে প্রকৃত জ্ঞানের দিকে চালনা করিতে হইলে, আমাদের উচ্চশিক্ষা আমাদেরই ভাষায় দিতে হইবে। নিজের ভাষা শিখিতে হইলে নিজের জাতীয় জীবনের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপিত করিতে হইবে এবং আমাদের শিক্ষাদীক্ষার যে সরল সত্যবাণী, তাহারই দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে।"

এই যে আমাদের জাতীয়তাবিকাশের পরিপন্থী শিক্ষাদীক্ষা, ইহাতে আমাদিগকে অনেক বিষয়ে অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে। আমাদের এত যে অর্থের অভিমান, ইহাও এই শিক্ষা হইতে জন্মিয়াছে। আসল কথা এই যে অভিমান, ইহা আমাদের এমনি অন্ধ করিয়া দিয়াছে যে, যাহাদের লইয়া দেশের রক্ত মাংস প্রাণ গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাদেরই বাদ দিয়া আমরা দেশের

কার্য্যকে স্বার্থক করিতে চাই। আমরা দেশের বাবুরা—প্রকৃত পক্ষে কুশিক্ষিত, তাই আমাদের এত অভিমান। আমরা গ্রামের অশিক্ষিত লোকের সঙ্গে মিশিব কি করিয়া? তাই আমরা তাহাদের সঙ্গে পৃথক হইয়া কার্য্য করিতে যাই। এখন যে আমাদের সম্মুখে বিস্তৃত কার্য্যক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে তাহাতে যে শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলকে একত্র হইয়া কার্য্য করিতে হইবে। এই যে দেশের কাজ, তাহা হিন্দু মুসলমান একত্র হইয়া মিলিয়া মিশিয়া করিতে হইবে—ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ এই শিক্ষিত জাতি যদি কৃষক চণ্ডাল প্রভৃতি অশিক্ষিত জাতিগুলির সহিত না মিশিতে পারে তবে কোন কালেই কার্য্যক্ষেত্রে সিদ্ধিলাভ হইবে না। চিত্তরঞ্জন তাঁহার সভাপতির অভিভাষণে এই কথাই হৃদয়গ্রাহী জ্বলন্ত ভাষায় বলিয়াছেন—

"যাহারা বর্ত্তমান বাঙ্গালার চারি কোটি যাট লক্ষের মধ্যে চারি কোটি, যাহারা দেশের সার বস্তু, যাহারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া মাটী কর্ষণ করিয়া আমাদের জন্য শস্য উৎপাদন করে, যাহারা ঘোর দারিদ্র্যের মধ্যেও মরিতে মরিতে বাঙ্গালার নিজের সভ্যতা ও সাধনাকে সজাগ রাখিয়াছে, যাহারা সর্ব্বপ্রকার সেবায় নিরত থাকিয়া আজিও বাঙ্গালীর ধর্ম্মকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে, যাহারা আজিও শুদ্ধচিত্তে সরল প্রাণে মর্ম্মে মর্ম্মে বাঙ্গালার মন্দিরে মন্দিরে পূজা দেয়, মসজিদে মসজিদে প্রার্থনা করে, যাহাদের জন্য বাঙ্গালী আজিও বাঙ্গালী, যাহারা বাঙ্গালার জলের সঙ্গে এক হইয়া বাঙ্গালী জাতির জাতিত্বকে জ্ঞানে কি অজ্ঞানে সাগ্নিকের অগ্নির মত

জ্বালাইয়া জাগাইয়া রাখিয়াছে, যাহাদের আমরা বিলাতী শিক্ষার মোহে, আইন আদালতের প্রভাবে, জমিদারের খাজনা ন্যায্যভাবে কি অন্যায় করিয়া বাড়াইবার জন্য শত প্রলোভন দেখাইয়া, শত অত্যাচার করিয়াও একেবারে নষ্ট করিতে পারি নাই, যাহারা বাস্তবিকই বাঙ্গালা দেশের একাধারে রক্তমাংসের প্রাণ, তাহারা বড় কি আমরা বড় ? সাবধান! ওঠ! জাগ। মিথ্যা অভিমানকে বর্জ্জন কর। ঐ যে বাঙ্গালার কৃষক সমস্ত দিন বাঙ্গালার মাঠে মাঠে আপনাদের কাজ ও আমাদের কাজ শেষ করিয়া দিবা অবসানে ঘর্ম্মাক্তকলেবরে বাঙ্গালার কুটীরে কুটীরে বাঙ্গালার গান গাইতে গাইতে ফিরিতেছে, উহারা মুসলমান হউক, শূদ্র হউক, চণ্ডাল হউক, উহারা প্রত্যেকেই যে সাক্ষাৎ নারায়ণ! ডাক, ডাক, সবাইকে ডাক! প্রাণের ডাক শুনিলে কেহ কি না আসিয়া থাকিতে পারে ?"

কিন্তু দেশের কাজ করিতে অগ্রসর হইলেই প্রথমে মনে হয় আমাদের গ্রাম-সমূহের অস্বাস্থ্যকরতার কথা। পল্লীসমাজ বাঙ্গালীর সভ্যতা সাধনার কেন্দ্রস্থল, সেই কেন্দ্রস্থল যদি ব্যাধি দুষ্ট হইয়া তাহার সঞ্জীবনী শক্তি হারাইয়া ফেলে, তাহার ফলে সমস্ত জাতিটাই অক্ষম ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে। এই অস্বাস্থ্যতা নিবন্ধন পল্লীগ্রাম ক্রমশঃই জনশূন্য হইয়া পড়িতেছে, এক দিকে ম্যালেরিয়ার আতঙ্ক, আর এক দিকে বড় বড় সহরে বিলাতি ব্যবসা বাণিজ্যের লোভ ও মোহ, কাজেই এই বড় বড় সহরগুলা এক একটা বৃহৎ অজগর সর্পের মত গ্রামবাসীদের টানিয়া আনিয়া

উদরযাৎ করিতেছে ; সুতরাং আমাদের প্রথম কার্য্য গ্রামের ও দেশের স্বাস্থ্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠা। এই অস্বাস্থ্যকরতার সঙ্গে জড়িত আছে আমাদের দারিদ্র্য। শরীর দুর্ব্বল হইলেই ব্যাধিমন্দির হইয়া পড়ে, আমাদের এক হাতে এই দেশের স্বাস্থ্যকে রক্ষা করিতে হইবে, আর এক হাতে তাহারই সঙ্গে যে দারিদ্র্য উহার সহিত আছে, তাহা ঘুচাইতে হইবে। স্বাস্থ্যের উন্নতি করিতে হইলে চাষাদিগকে সেই সম্বন্ধে শিক্ষাদান করিতে হইবে, গ্রামে গ্রামে জলকষ্ট নিবারণ করিতে হইবে, নূতন পুষ্করিণী খনন করিতে হইবে, পুরাতন পুষ্করিণীর সংস্কার করিতে হইবে, বন জঙ্গল পরিষ্কার করিতে হইবে এবং চাষারা যাহাতে আরও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে জীবন ধারণ করিতে পারে, তাহার উপায় করিয়া দিতে হইবে। অর্থাগমের ব্যবস্থা করিতে হইলে চাষাকে দেশের রাক্ষস মহাজনদের হাত হইতে রক্ষা করিয়া কম সুদে তাহার আবশ্যকীয় টাকা ধার দিবার জন্য গ্রামে গ্রামে তাহাদের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া ছোট খাট ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে কার্য্য করিতে হইলে আমাদিগকে একটা প্রণালী ধরিয়া চলিতে হইবে। কারণ আমাদের সরল জীবন অনেকটা জটিল হইয়া পড়িয়াছে। তাই নিয়ম চাই—প্রণালী চাই। চিত্তরঞ্জন তাঁহার সভাপতির অভিভাষণে একটা প্রণালীর কথা বলিয়াছেন—

"জন সংখ্যা ও কার্য্যের সুবিধা অনুসারে, কতকগুলি গ্রাম লইয়া এক একটি পল্লী বা গ্রাম্য সমাজ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

(৭৬)

এই সব গ্রামের ১৬ বছরের যুবক হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ণ ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকলেই এই সমাজভুক্ত হইবে। তাহারা সকলে মিলিয়া পাঁচজন পঞ্চায়েত নির্ব্বাচন করিবে। এই পঞ্চায়েতের উপর ঐ সকল গ্রামসমূহের সকল কার্য্য—সকল শুভাশুভের ভার অর্পিত হইবে। তাঁহারা গ্রামের পথ-ঘাটের ব্যবস্থা করিবেন। গ্রামের স্বাস্থ্য কি করিয়া রক্ষা করা যায়, তাহার উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া, তাহাকে কার্য্যে পরিণত করিবেন। তাঁহারা এই সকল গ্রামে আমাদের দেশের যে সকল যাত্রা গান ছিল, সেই সব আবার চালাইতে চেষ্টা করিবেন। নৈশবিদ্যালয় স্থাপন করিয়া শিক্ষার বিস্তার করিবেন। চাষাকে কৃষিকার্য্য সম্বন্ধে, যে সকল শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক, তাহা ব্যবস্থা করিবেন। তাঁহারাই আবশ্যকীয় নূতন পুষ্করিণী খনন করাইবেন ও পুরাতন পুষ্করিণী সংস্কার করাইবেন। সমস্ত গ্রামগুলি যাহাতে পবিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে, তাহা দেখিবেন। চাষারা যাহাতে বারমাস পরিশ্রম করিয়া নিজেদের আবশ্যকীয় দ্রব্যসকল প্রস্তুত করিতে পারে ও অন্যান্য শিল্পপণ্যও প্রস্তুত করিতে পারে, তৎসম্বন্ধে তাহাদিগকে শিক্ষা দিয়া এই সব কার্য্যের উপায় করিয়া দিবেন। এই পল্লী-সমাজ প্রতি পল্লীতে একটি সাধারণ ধান্যাগার স্থাপন করিবেন। প্রত্যেক গৃহস্থ চাষা মাত্রেই সেই ধান্যাগারে তাহাদের ক্ষেতের ফসল হইতে কিছু কিছু করিয়া ধান্য দিবে। পল্লীসমাজ সেই ধান্যাগার যাহাতে সুরক্ষিত থাকে, তাহার ব্যবস্থা করিবেন। যখন অজন্মা, দুর্ভিক্ষ বা বীজের জন্য ধান্যের অভাব হইবে, তখন পল্লীসমাজ

চাষাদের প্রয়োজন মত হিসাব করিয়া ধার দিবেন। পরে আবার ফসল হইলে তাহার সেই পরিমাণ ধান্য ধান্যাগারে পূরণ করিয়া দিবে।

এই সব গ্রামবাসীদের মধ্যে কোন কলহ অথবা ছোট ছোট দেওয়ানীও ও ফৌজদারী মকদ্দমা উপস্থিত হইলে, উক্ত পঞ্চায়েতই তাহার নিষ্পত্তি করিয়া দিবেন এবং বড় ফৌজদারী ও দেওয়ানী মকদ্দমা তদন্ত করিয়া সবডিভিসন ও জেলার আদালতে পাঠাইয়া দিবেন। তাঁহাদের সেই তদন্ত বিবরণই সব আদালতে নালিশ ও আর্জ্জী বলিয়া গৃহীত হইবে।

এইরূপে প্রত্যেক জেলার জনসংখ্যা অনুসারে ২০টি ২৫টি পল্লীসমাজ থাকিবে, এই প্রত্যেক পল্লীসমাজে পাঁচজন পঞ্চায়েত ব্যতীত, জেলা সমাজের জন্য জনসংখ্যা অনুসারে পাঁচ হইতে পঁচিশটি পর্য্যন্ত সভ্য নির্ব্বাচন করিবেন। এই পল্লীসমাজের নির্ব্বাচিত সভ্য লইয়া জেলা সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে। প্রত্যেক পল্লীসমাজ এই জেলা সমাজের অধীনে সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে। এই জেলা সমাজ—

(১) সেই জেলা-ভুক্ত সকল পল্লী সমাজের কার্য্য তদন্ত করিবে।

(২) সকল পল্লীসমাজের শিক্ষা দীক্ষার কার্য্য যাহাতে সুসম্পন্ন হয়, তাহার উপায় করিয়া দিবে ও জেলার যে রাজধানী, তাহার শিক্ষাদীক্ষার ভার লইবে।

(৩) কৃষিকার্য্য ও কুটীর শিল্পের যাহাতে উন্নতি ও প্রসার হয়, তাহার উপায় উদ্ভাবন করিয়া কার্য্যে পরিণত করিবে।

(৮) সকল পল্লীসমাজের অধীন সেই সব গ্রাম তাহার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তদন্ত করিবে ও সকল পল্লীসমাজ সেই স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সৎপথে চালাইয়া লইবে। ইহা ব্যতীত জেলার যে সহর বা রাজধানী, তাহারও স্বাস্থ্যরক্ষার ভার জেলা সমিতির অধীন থাকিবে।

(৯) জেলার মধ্যে কোন্ কোন্ দ্রব্যের ব্যবসা বাণিজ্য চলিতে পারে তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া ও উপযুক্ত লোক নির্ব্বাচন করিয়া ছোট খাট ব্যবসা চালাইতে হইবে।

(১০) এই জেলা-সমাজ একজন সভাপতি নির্ব্বাচন করিবে, প্রত্যেক বিষয়ের জন্য ভিন্ন সভা গঠিত করিবে। কিন্তু প্রত্যেক সভাই এই জেলা সমিতির অধীন কার্য্য করিবে।

(১১) জেলার কৃষিকার্য্য, কুটীর শিল্প ও অন্যান্য ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য, অর্থের সুবিধার জন্য একটি ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। এই ব্যাঙ্কের শাখা প্রত্যেক পল্লীসমাজেই এক একটি করিয়া থাকিবে। চাষারা মহাজনদের নিকট হইতে দাদন না লইয়া এই ব্যাঙ্ক হইতে টাকা লইবে, এবং তাহারা যাহাতে খুব কম সুদে টাকা ধার পায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই ব্যাঙ্ক যাহাতে জেলার সকলের সমবেত চেষ্টার দ্বারা চালিত হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(১২) জেলা ও পল্লী সমাজের কোন কার্য্যেই গভর্ণমেণ্টের কোন কর্ম্মচারী সংশ্লিষ্ট থাকিবে না।

(১৩) জেলা সমাজ ও পল্লীসমাজের সকল কার্য্য নির্ব্বাহ

করিবার জন্য ট্যাক্স করিয়া আবশ্যকীয় টাকা উঠাইবার ক্ষমতা জেলা-সমাজের হস্তে নিহিত থাকিবে।

(১৪) পল্লী সমাজ ও জেলা সমাজের এই সমস্ত কার্য্য প্রণালী স্থিরীকরণ করিবার জন্য ও ক্ষমতা দিবার জন্য আবশ্যকীয় আইন করিতে হইবে।

এই যে পূর্ব্বোক্ত প্রণালীর কথা যাহা চিত্তরঞ্জন তাঁহার সভাপতির অভিভাষণে উল্লেখ করিয়াছিলেন তাহাও সম্পূর্ণ socialism এর কথা। এই যে পল্লী বা গ্রাম্য সমাজের কথা তিনি বলিয়াছেন, তাহা অতি প্রাচীনকাল হইতেই এদেশে ছিল। এই নির্ব্বাচন আগে অব্যক্ত ছিল, এখন সেটাকে ব্যক্ত করিবার পরামর্শ তিনি দিয়াছেন। আগে আমাদের জীবন আরও অনেক বেশী সবল ছিল, পঞ্চায়েতের প্রথা পুরাকালে গ্রামের মধ্যে আপনা আপনিই ফুটিয়া উঠিত। পল্লীসমাজের যে পঞ্চায়েত, তাহা এমন পাঁচজনেই হইতেন, যাঁহাদের উপর পল্লীসমাজের দৃষ্টি সহজভাবেই আপনা আপনিই পড়িত। পল্লীবাসীদের মধ্যে যে প্রীতি জাগিয়া থাকিত, তাহা কোন কথা না বলিয়া, কোন আড়ম্বর না করিয়া যেন নিঃশব্দে অলক্ষিতে সেই পাঁচজনকে দেখাইয়া দিত। সেই পাঁচজন, পঞ্চায়েতের অধিকার স্বভাবগুণে সহজভাবে আকর্ষণ করিতেন ও পল্লীসমাজ বাসীরা সেই একই স্বভাবগুণে, সেই একই প্রকার সহজ সরলভাবে সেই অধিকার মানিয়া লইত। সেই পঞ্চায়েতই জমিদারের কাছে আবেদন করিয়া পুকুর কাটাইয়া সংস্কার করিয়া লইত। সহজভাবে শিক্ষা

দীক্ষা বিস্তার করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিত, পল্লীসমাজভুক্ত গ্রাম সকলের স্বাস্থ্যরক্ষার কার্য্য মিষ্ট কথা বলিয়া গায়ে হাত বুলাইয়া করাইয়া লইত। পল্লীসমাজের কোন চেষ্টা, কোন কার্য্য তাহাদের অমতে কি তাহাদের সাহায্য না লইয়া হইতে পারিত না। এই অব্যক্ত নির্ব্বাচনকে এখন বক্তব্য করিবার প্রয়োজন হইয়াছে। আমাদের জীবন সে পরিমাণে সহজ সরল নাই। অনেকটা জটিল হইয়া পড়িয়াছে। গ্রামের সঙ্গে জেলার একটা স্বাভাবিক যোগ হইয়াছে। ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের অধীন থাকিয়া নানাপ্রকার কাজ কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া গ্রামের লোক অনেকে জেলার সবডিবিসনে সহরে ও রাজধানীতে আসিয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সেই জন্যই পুরাকালে যেখানে পল্লীসমাজই জীবনের কেন্দ্র ছিল, এখন জেলার রাজধানী সেই কেন্দ্রস্থান অধিকার করিয়াছে। তাই সমস্ত জেলাকে একটা বড় পল্লীসমাজ জ্ঞান করিয়া সমস্ত পল্লীসমাজগুলি এই কেন্দ্রসমাজের সহিত যুক্ত করিয়া দেওয়া আবশ্যক। এখন কথা এই যে এতটা অধিকার আমাদিগের হস্তে আসিবে কি না!—আংগ্লো ইণ্ডিয়ান কাগজের সম্পাদকেরা আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিয়া বলেন—না, না, না! যে দেশে এনার্কিষ্ট অত্যাচারের এত প্রাদুর্ভাব, সে দেশের জনসাধারণের হাতে এত ক্ষমতা থাকিলে ইহার অপব্যবহার হইবে। কিন্তু আসল কথা এইরূপ একটা কার্য্য করিবার অধিকার ও ক্ষেত্র থাকিলে তথাকথিত রাজদ্রোহ কমিবেই। এই সম্বন্ধে চিত্তরঞ্জন তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছেন—

"স্বদেশী আন্দোলনের পরে আমাদের দেশের যুবকবৃন্দের মনে ও প্রাণে দেশের জন্য কাযে লাগিবার একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে, অর্দ্ধোদয় যোগের সময় কলিকাতা সহরে ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে তাহারা যথার্থ কার্য্য করিবার যে ক্ষমতার প্রমাণ দিয়াছে, তাহা আমাদের রাজকর্ম্মচারীরা পুনঃ পুনঃ স্বীকার করিয়াছেন। সে দিন যখন দামোদরের বন্যায় অনেক গ্রাম অনেক সহর ভাসিয়া গিয়াছিল, তখন আমাদের দেশের যুবকবৃন্দ দলবদ্ধ হইয়া সেই সব বন্যাপীড়িত নিরাশ্রয় গ্রামবাসীদিগের যে সাহায্য করিয়াছিল, তাহাতে কি তাহাদের দেশের জন্য কার্য্য করিবার আকাঙ্ক্ষা ও ক্ষমতা প্রকাশ পায় নাই? আমার মনে হয়, এই কায করিবার ক্ষমতা সত্ত্বেও কাজে লাগিতে না পারায় দেশের যুবকদিগের মধ্যে একটা অসহিষ্ণুতার ভাব—একটা নৈরাশ্যের বেদনা জাগিয়া উঠিয়াছে। এই রাজদ্রোহিতা সেই অসহিষ্ণুতা বা সেই নৈরাশ্যেরই ফল!"

এখন এই অপরাধের মূলীভূত কারণ দূর করিতে হইলে দেশের যুবকদিগকে দেশের কাযে লাগাইয়া দিতে হইবে। ইংরাজ আমাদের অনেক উপকার করিয়াছে, এজন্য আমাদের চিরকালই কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকা উচিত। ইংরাজ আমাদের দেশে আসিয়া যে একটি বিপরীত সভ্যতা ও সাধনার আদর্শ আমাদের চক্ষের সম্মুখে ধরিয়া দিয়াছে এবং সেই বাহিরের আঘাতেই যে আমাদের জাতীয় জীবনের নব প্রতিষ্ঠার সাহায্য করিয়াছে, তাহা সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন।

তাই বলিয়া কেবলই কি আমাদেরই ইংরাজের প্রতি কর্ত্তব্য আছে? ইংরাজ কি আমাদের নিকট হইতে কোনও উপকার পায় নাই? এই জন্য কি আমাদিগকে গড়িয়া উঠিবার অধিকার ইংরাজের দেওয়া কর্ত্তব্য নয়? চিত্তরঞ্জন এ সম্বন্ধে বলিতেছেন—

"আমাদের যা স্বাভাবিক কৃতজ্ঞতা তাহা আমাদের চিরকালই আছে। কিন্তু এই কৃতজ্ঞতার আর একটা দিক আছে, তাহা যেন ইংরাজ ভুলিয়া যান না। এদেশে আসিয়া রাজত্ব বিস্তার করিয়া কি ইংরাজের কোন লাভ হয় নাই? জগতের ইতিহাসে বাঙ্গালা দেশে আসিবার আগে ইংরাজের কোন লাভ হয় নাই? জগতের ইতিহাসে বাঙ্গালা দেশে আসিবার আগে ইংরাজের যে স্থান ছিল, এখনও কি ঠিক সেই স্থান? এই দেশের রাজত্বের সঙ্গে ইংরাজের অবস্থার কি শত সহস্র গুণ উন্নতি হয় নাই? সমগ্র মানব সমাজে যে ইংরাজ আজ শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে, তাহাতে কি বাঙ্গালার সমস্ত ভারতবর্ষের কোন হাতই ছিল না? এই যে কৃতজ্ঞতা, ইহা কি শুধু আমাদেরই? ইংরাজের কৃতজ্ঞ হইবার কি কোন কারণ নাই? এই যে প্রাচ্য প্রতীচ্যের মিলন ইহাতে আমাদের ও তোমাদের পরস্পরের কৃতজ্ঞ হওয়া কর্ত্তব্য। আমরা চিরকালই আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া আসিতেছি ও কার্য্যক্ষেত্রে সহস্র প্রকারের সেবা দ্বারা তাহার প্রমাণ দিয়াছি। তোমাদের যে কৃতজ্ঞতা, তাহার প্রমাণ আজ চাই। শুধু মুখের কথায় আর আমরা ভুলিব না। আমাদের যে নিজের হাতে নিজের কাজ করিবার নিতান্ত ন্যায়সঙ্গত আকাঙ্ক্ষা, সে আকাঙ্ক্ষা

যদি পূর্ণ না কর—এই সামান্য অধিকার যদি আমাদের না দাও, তবে তোমাদের কৃতজ্ঞতার কোনও অর্থ নাই।"

আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার কথা ভাবিতে গেলে প্রথমেই আমাদের কৃষিজীবির কথা মনে আসে। তারপরই আমাদের দারিদ্র্যের কথা মনে হয়। আমরা সকলেই জানি যে ব্যবসা বাণিজ্যের অভাবে কৃষিকার্য্যই আমাদের উপজীবিকার প্রধান উপায়। আমরা সকলেই জানি যে বাঙ্গালী জাতির মত এত দরিদ্রজাতি বোধ হয় জগতে আর নাই। বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির সভাপতির অভিভাষণে চিত্তরঞ্জন বাঙ্গালা দেশের কৃষি-জীবিদের যে করুণ চিত্র আমাদের নয়নের সম্মুখে স্থাপন করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই আমাদিগের মনে বাঁচিয়া থাকিবার একটা সংশয় জাগাইয়া আমাদিগকে সত্যই ভাবাইয়া তুলে। আমাদিগের দেশের কৃষকের প্রত্যেকের বার্ষিক আয় গড়ে ১৬৲ টাকা হইতে ২০৲ টাকার মধ্যে। ২০৲ টাকাই হউক আর ৩০৲ টাকাই হউক, এই টাকায় কোন কৃষকই তাহার নিতান্ত আবশ্যকীয় অভাবগুলিও পূর্ণ করিতে পারে না। গভর্ণমেণ্টের জেলেও প্রত্যেক কয়েদীর জন্য বাৎসরিক ৪৮৲ টাকা করিয়া খরচ করা হয়। ইহা কি আমাদের ঘোর দারিদ্র্যের স্পষ্ট প্রমাণ নয়? বাঙ্গালা দেশে এমন গ্রাম নাই—যেখানে অন্ততঃপক্ষে শতকরা ৭৫ জন ঋণগ্রস্ত নহে। এমন অনেক গ্রাম আছে যেখানে শতকরা ১০০ জনই ঋণদায়ে পীড়িত। মানুষ ভাল করিয়া জীবন ধারণ করিতে না পারিলে মনুষ্যত্বের বিকাশ অসম্ভব। সুতরাং দেশ

হইতে আমাদের এই ঘোর দারিদ্র্যের দূর করিতে হইবে। তাই চিত্তরঞ্জনের মতে—"আমাদের প্রথম ও প্রধান কার্য্য গ্রামের ও দেশের স্বাস্থ্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা। কারণ, অস্বাস্থ্যের সঙ্গে আমাদের দারিদ্র্যের যোগ আছে। আমাদের এক হাতে দেশের স্বাস্থ্যকে রক্ষা করিতে হইবে, আর এক হাতে তাহারই সঙ্গে আমাদের যে দারিদ্র্য তাহাও ঘুচাইতে হইবে। স্বাস্থ্যের উন্নতি করিতে হইলে চাষাদিগকে সেই সম্বন্ধে শিক্ষা দান করিতে হইবে, গ্রামে গ্রামে জলকষ্ট নিবারণ করিতে হইবে, বন জঙ্গল পরিষ্কার করিতে হইবে। অর্থাগমের ব্যবস্থা করিতে হইলে চাষাকে কম সুদে তাহার আবশ্যকীয় টাকা ধার দিবার জন্য গ্রামে গ্রামে ছোট খাট ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।"

এখন এই দারিদ্র্যের অবসান কি করিয়া হইতে পারে এবং শুধু কৃষিকার্য্যে আমাদের জীবন ধারণ করাও অসম্ভব। কেন আমাদের এই দশাবিপর্য্যয় ঘটিল? উত্তরে চিত্তরঞ্জন বলিয়াছেন যে আমাদের বাণিজ্য নাই, তাই মা লক্ষ্মীও বাঙ্গালা ছাড়িয়া গিয়াছেন। দুর্ভাগা বাঙ্গালী আমরা বণিকের যূপকাষ্ঠে আমাদের শিল্প, ব্যবসা, বাণিজ্য সকলই বলি দিলাম। আমাদের ঘরে ঘরে চরকা ভাঙ্গিয়া গেল, আমাদের হস্তপদ ছিন্ন করিলাম, আমাদের ঘরের লক্ষ্মীকে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিলাম। আমাদের বাঙ্গালার ঘরে ঘরে ধান ছিল, ঘরের গাই দুধ দিত, জলাশয় মাছ দিত, তৃণশ্যাম শস্যক্ষেত্র, গোচারণ ভূমি ছিল, গাছের ফল ছিল, খড়ের ছাউনির ঘর ছিল, সুনীল আকাশ, সবুজ গাছের ও

মাঠের পানে চাহিলে চোখ জুড়াইয়া যাইত। চাষা সারাদিনের পরিশ্রমের পর ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে সন্ধ্যাদীপ জ্বালা ঘরে মেঠোসুরে প্রাণের গান গাহিতে গাহিতে ফিরিয়া আসিত। বাঙ্গালার পুকুরের জল তখন মিঠা ছিল, চাষা বৎসরে ছয় মাস তাহার পেটের জন্য খাটিত, তাহার ঘরে ধানের মরাই ছিল, বাকী ছয়মাস সে গৃহস্থালী করিয়া বাঙ্গালার স্বভাব ধর্ম্মসঙ্গত চিরকালের অভ্যাস বশতঃ নানাবিধ পণ্যদ্রব্য তৈয়ারি করিত। সে চাষা এখন নাই, সে গৃহস্থালী এখন নাই, সে গৃহধর্ম্মও এখন নাই—আর সে গৃহও এখন নাই। ঘরে চাল নাই, গরু দুধ দেয় না, ঘরে সন্ধ্যাদীপ পড়ে না, দেবতা উপবাসী—সেবা হয় না, পেটের দায়ে কৃষক হালের গরু বেচিয়া কোন রকমে খাইয়া বাঁচে। জলাশয় শুকাইয়া কাদা হইয়াছে জলকষ্টে—বিশুদ্ধ জলের অভাবে নানাপ্রকার ব্যাধি আসিয়া চাষার সে স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি একেবারে নষ্ট করিয়াছে, তাহার যে সহজ সরল স্বাভাবিক জীবন ছিল, তাহা হারাইয়া উৎকট ব্যাধি লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। তাই চিত্তরঞ্জন তাঁহার অভিভাষণে ইহার একটা প্রতিকারের কথা বলিয়াছেন—

"শুধু কৃষিকার্য্যে আমাদের জীবন ধারণ করা অসম্ভব। সুতরাং ব্যবসাবাণিজ্যের উপায় অবলম্বন করিতেই হইবে। কিন্তু সে উপায় বিলাতি industrialism বা কারখানা স্থাপন নয়। আমাদের বাঙ্গালী জাতীর ইতিহাসের ব্যবসা-বাণিজ্যের ও একটা রীতি আছে। আমাদের দেশে চিরকালই চাষা তাহার কৃষি-

কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে সে আপনার আবশ্যকীয় জিনিষপত্র অর্থাৎ খাদ্য ও পরিধানের বস্ত্র আপনিই তৈয়ারি করিয়া লইত। লজ্জা নিবারণের জন্য ম্যানচেষ্টারের দিকে চাহিয়া থাকিতে হইত না। তাহা ছাড়াও চাষাদের ঘরে ঘরে অনেক কুটীর শিল্পের চলন ছিল, সুতরাং এই কুটীর শিল্প, পণ্য ও কৃষিকার্যের দ্বারা তাহার যথেষ্ট অর্থাগম হইত। কুটীর শিল্প জাত যে পণ্য, তাহা এক রকম উঠিয়া গিয়াছে; পূর্ব্বে আমাদের বাঙ্গালা দেশে ঢাকা, টাঙ্গাইল, শ্রীরামপুর, ফরাসডাঙ্গা, সিমলা, শান্তিপুর ও অনেক স্থানে কাপড় প্রস্তুত হইত। এখনও যে একেবারে হয় না, তাহা নহে। কিন্তু প্রায় মরিয়া আসিয়াছে। যে ভাবে পূর্ব্বে আমরা কাপড় ও সূতা তৈয়ারি করিতাম, চরকায় আবার কেন তেমনি ভাবে সূতা কাটিয়া কাপড় তৈয়ারীর ব্যবস্থা করি না? কাঁসা পিতলের বাসন যাহা মুরশিদাবাদ, খাগড়া, ঢাকা, এমন কি, কলিকাতার কাঁসারি পাড়ায় ও তৈয়ারী হইত, তাহা প্রায় উঠিয়া গিয়াছে, তাহার বদলে বিলাতি এনামেলের বাসন আর নানা প্রকার ফুল লতাপাতা কাটা রঙ্গিন কাচের বাসন আমাদের ঘরে ঢুকিয়াছে। এইরূপে আমাদের দেশে কাগজ তৈয়ারি হইত. সোনারূপার অনেক প্রকার অলঙ্কার আমরা তৈয়ারি করাইতাম। ঝিনুকের শিল্প, ডাকের সাজ ও অনেক প্রকার শিল্পের কাজ যাহা এক সময়ে আমাদের দেশের গর্ব্ব ছিল আজ তাহার পুনরুদ্ধার করিতে হইবে।"

কিন্তু কেমন করিয়া আমাদের দেশের সে প্রাচীন শিল্পের উদ্ধার করিব। কারণ কল কারখানার উপর যে ব্যবসা-বাণিজ্য

প্রতিষ্ঠিত তাহার সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া আমাদের দেশের শিল্প বাঁচিয়া উঠিতে পারিবে না। সুতরাং প্রথমেই আমাদের বিলাসবর্জ্জন করিতে হইবে। কারণ এই যে বিলাসের মোহ, এই যে অযাচিত অবসাদ যাহা আমাদের নানাপ্রকার অস্বাস্থ্য ও ব্যাধির সঙ্গে সঙ্গে শুধু ভদ্রলোকের গৃহে নয়, কৃষকের কুটীরে পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে তাহাকে জীর্ণবস্ত্রের মত পরিহার করিতে হইবে। তাই চিত্তরঞ্জন বলিয়াছেন—

"মোটা কাপড় যদি আমাদের কটিতে ব্যথা দেয়, সেই বেদনা আমাদের অকাতরে আপনার ও দেশের কল্যাণের জন্য সহ্য করিতে হইবে। এই বিলাস-বর্জ্জনে যে সংযম আবশ্যক, সেই সংযমের সাধন করিতে হইবে এবং আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে ভদ্রলোকের ঘরে যাহা আরম্ভ হইবে, চাষার ঘরে তাহা অল্পদিনের মধ্যেই প্রচার হইয়া পড়িবে। এই সংযম আমাদের প্রত্যেকের প্রাণকে উদ্বুদ্ধ করাইয়া আমাদের প্রত্যেকের প্রাণের সংবিৎকে জাগরণের পথে আনিয়া, সমাজ ও সংবিতের সহিত এক সূত্রে বাঁধিয়া দিবে। এই সংযমে ব্যক্তিও বাঁচিবে, সমাজও বাঁচিবে এবং আমাদের বাঁচিয়া উঠা পরিপূর্ণরূপে সার্থক হইবে। ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক্ দিয়া দেখিতে হইলে এই সংযম গ্রহণ ও বিলাস বর্জ্জনের ফলে আমরা অনেক অনাবশ্যকীয় পণ্যদ্রব্যের হাত হইতে রক্ষা পাইব।"

বস্তুতঃ এই হইবে আমাদের দেশের কৃষিকার্য্যের উৎকর্ষ সাধন ও লুপ্ত ব্যবসা-বাণিজ্যের পুনরুদ্ধারের উপায়।

এই socialism এর সঙ্গে সঙ্গে চিত্তরঞ্জনের জীবনে ফুটিয়া উঠিয়াছে অসাধারণ পরোপকারস্পৃহা ও স্বদেশপ্রেমিকতা। তাঁহার জীবন সকল দিক হইতে বিশ্লেষণ করিলে মনে হয় বুঝি ইহা তাঁহার পক্ষে মোটেই অসাধারণ নয় বরং যেন জীবনের স্বাভাবিক পরিণতি। এই স্বদেশ প্রেমিকতার জন্য তাঁহার ব্যবসায়ে খুবই ক্ষতি হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার কোমল প্রাণের কাছে এ ছাড়া বুঝি গত্যন্তর ছিল না। যখন মধ্য প্রদেশের "হোমরুল লীগ" (স্বরাজ সভার) এর সম্পাদক 'বৈদ্য'কে বিনাদোষে সার্দ্ধ এক বৎসর কারাবাসের আদেশ দেওয়া হয়, তখন ভারতরঞ্জন চিত্তরঞ্জনই বৈদ্যের পক্ষে মোকদ্দমা চালাইবার জন্য নাগপুরে গিয়া উপস্থিত হন এবং আপনার অদ্ভুত আইন জ্ঞানের দ্বারা বিচারপতিকে মুগ্ধ করিয়া কারাবাসাসের আদেশ যে অসঙ্গত তাহাই প্রমাণ করিয়া দেন। এইরূপে নিঃস্বার্থ পরোপকারস্পৃহার গুণে বৈদ্যের মুক্তিলাভ হইলে মধ্যপ্রদেশে চিত্তরঞ্জনের নাম সুপরিচিত হইয়া গেল। সেই সময়ে মোকদ্দমা শেষ হইবার পর তিনি সেখানে কয়েকটি বক্তৃতা দিয়া স্বায়ত্তশাসন ও স্বরাজ সম্বন্ধে সাধারণকে বুঝাইতে চেষ্টা করেন। মধ্যদেশবাসীরা তাঁহাদের কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ তাঁহাকে একটি অঙ্গুরীয় উপহার দেন। সেখানে মোকদ্দমায় কোনও রূপ উপার্জ্জন না হইলেও তাঁহার বদান্যতা বন্ধ ছিল না। তিনি সেখানকার স্বরাজ সভায় প্রচুর অর্থ দান করেন।

এই মোকদ্দমার কিছু দিন পরে চিত্তরঞ্জন ডাক্তার মেটা প্রভৃতি রাজনীতিক অপরাধে অভিযুক্ত দেশনেতৃগণের পক্ষ সমর্থন

করিবার জন্য রেঙ্গুন গমন করেন। সেখানে তিনি ভারতরক্ষা আইনের অযৌক্তিকতা সম্বন্ধে আদালতে যে বক্তৃতা করেন তাহা বিচারপতিকে পর্য্যন্ত মুগ্ধ করে এবং ফলে ডাক্তার মেটা প্রভৃতি দেশনেতৃগণ মুক্তি লাভ করেন।

ইহার পর তিনি কুতুবদিয়া রাজদ্রোহ অপরাধে অবরুদ্ধ যুবকদিগের পক্ষ লইয়া চট্টগ্রামে গমন করেন। এই যুবকদিগকে কুতুবদিয়ায় একটি সর্পপরিবেষ্টিত কুটীরে রাখা হয়, তাঁহারা প্রাণের দায়ে সেই অবরোধ হইতে পলাইয়াছিলেন, ইহাই তাঁহাদের অপরাধ।

এই সকল মোকদ্দমা তিনি বিনা অর্থে গ্রহণ করিয়া সে গুলি বিশেষ যত্নের সহিত পরিচালিত করিতেন। তিনি যখন যে পক্ষের মোকদ্দমার ভার গ্রহণ করিয়াছেন, নিজের সমস্ত যত্ন ও চেষ্টা সেই কার্য্যে ব্যয় করিতে কোন দিন কৃপণতা প্রকাশ করেন নাই। জীবনে তাঁহার এরূপ অনেক দিন কাটিয়াছে যখন তিনি মোকদ্দমার কাগজপত্র লইয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা ক্রমাগত চিন্তা করিয়া স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তখন তিনি এরূপ তন্ময় থাকিতেন যে বাহিরের কিছুর প্রতিই তাঁহার জ্ঞান থাকিত না। এমন সময় পাঁচ মিনিট দাঁড়াইলে তাঁহাকে ডাকিলেও কোন সাড়া পাওয়া যাইত না। যোগনিমগ্ন সন্ন্যাসীর মত তিনি আপনার ধ্যানে আপনি নিমগ্ন থাকিতেন।

চিত্তরঞ্জন চিরকালই ভাবপ্রবণ। তাঁহার কাব্যজীবনে,

তাঁহার সামাজিক জীবনে আমরা এই ভাবপ্রবণতারই পরিচয় পাইয়া আসিয়াছি। রাজনীতিক জীবনেও ঠিক ঐ প্রকার ভাবপ্রবণতার নিদর্শনই দেখিতে পাই। তাঁহার জীবনটা ঠিক যেন একটি ভাবতন্ত্রী নির্ম্মিত বীণা, যখন যে ভাবের তারে আঘাত লাগিয়াছে, তখনই উহা ঝঙ্কার তুলিয়াছে। শ্রীমতী আনি বেসেণ্টের অন্তরীণ আদেশে তাঁহার মানব প্রীতির তারে আঘাত লাগিল, এবং তখন হইতে তাঁহার জীবনবীণার যে ঝঙ্কার সেই প্রথম উহার রাজনীতিক আন্দোলনের সুর। প্রকৃতপক্ষে রাজনীতিক্ষেত্রে চিত্তরঞ্জনের প্রবেশ এই অন্তরীণ ব্যাপার উপলক্ষ্য করিয়া। শ্রীমতী আনি বেসেণ্টের অন্তরীণ আদেশের প্রতিবাদ সভায় চিত্তরঞ্জন যে বক্তৃতা দেন তাহাতে তিনি বলেন :—

"বিলাতের প্রধান মন্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন শুধু অর্থনীতির দিক দিয়া নয় রাজনীতির দিক দিয়াও ভারতবর্ষের পুনর্গঠন একান্ত প্রয়োজনীয়। সমগ্র বৃটিশ সাম্রাজ্য কেবল ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নহে ইহার প্রত্যেক খণ্ডের স্বায়ত্ত শাসনের উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং জাতি বর্ণ ধর্ম্ম ও ভাষা বিভিন্ন হইলেও এই স্বায়ত্ত শাসনে পরিচালিত রাজ্যখণ্ডগুলি এক বিশাল প্রজাতন্ত্র সাম্রাজ্যে সংযুক্ত থাকিবে। এই যে প্রতিজ্ঞার কথা—আশার বাণী ইহা প্রত্যেক অন্তরীণ আদেশে ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে। আমাদের এইরূপ আশা দেওয়া হউক আর না হউক, আমি এই অন্তরীণ আদেশগুলির তীব্র প্রতিবাদ করিবই কারণ এইরূপ প্রত্যেক আদেশ মানুষের ন্যায্য বিচারের ব্যভিচার এবং মনুষ্যত্বের উপর

ভীষণ অত্যাচার। * * * * আমার মনে হয় ভগবান্ কেবল একবার ক্রুশে আবদ্ধ হন নাই, অত্যাচারী ও উৎপীড়নকারীরা বার বার মনুষ্যত্বকে এইরূপে ক্রুশে বদ্ধ করিয়াছে এবং মনুষ্যত্বের উপর এইরূপ প্রত্যেক অত্যাচার ভগবানের পবিত্র দেহে এক একটি নূতন পেরেক প্রবেশ করাইয়া দিতেছে। আংগ্লো ইণ্ডিয়ান সম্পাদকেরা ক্রমাগত বলিতেছে—'তোমারা অধীর হয়ো না, অনেক সময় আছে।' পৃথিবীতে ভারতবাসীদের মত এমন সহিষ্ণু জাতি আর নাই, কিন্তু সে ধৈর্য্যেরও সীমা আছে। বাস্তবিকই আমরা অধীর হইয়া পড়িতেছি। যখন আমরা দেখিতেছি আমাদের শাসকসম্প্রদায় কথায় এক আর কাজে পৃথক, তবে কি আমরা বলিব না "কেন এই আশার কথা বল। * * * দেশে যখন শান্তি নাই তখন কেমন করিয়া আমরা স্থির থাকিয়া শান্তির কথা বলি।"

১৯১৭ সনের আগষ্ট মাসে ভারতসচিব মণ্টেগু সাহেব ঘোষণা করেন যে ভারতবাসীদিগকে অবিলম্বে অধিকতর রাজনীতিক অধিকার দেওয়া হইবে। ক্রমে ক্রমে এই অধিকার বৃদ্ধি করিয়া পরিশেষে ভারতবাসীকে স্বায়ত্তশাসন দেওয়া ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য। এই ঘোষণার ফলে একদিকে ভারতবাসিগণ যেমন আশায় উৎফুল্ল হইল অপরদিকে শ্বেতাঙ্গগণ তাহাদের অধিকার ও স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইয়া আসিবে এই আশঙ্কায় ভারতীয়গণের রাজনীতিক স্বাতন্ত্র্য পাইবার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিতে লাগিল। এই সময় দেশপ্রাণ চিত্তরঞ্জন দেশবাসীদিগকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য

স্থানে স্থানে বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কলিকাতায় এক হিন্দু মুসলমানের সভায় তিনি বলিয়াছিলেন—

"আজ পূর্ব্ব বাঙ্গালার প্রায় প্রত্যেক গৃহে একটা গভীর বিষাদের ছায়া পড়িয়াছে, কারণ প্রতি গৃহ হইতে একজন কি তদপেক্ষা অধিক কর্ম্মক্ষম যুবককে আত্মরক্ষার সুবিধা না দিয়া বিচার না করিয়া অবরুদ্ধ করা হইয়াছে। * * * যখন ভারতগভর্ণমেণ্ট প্রচার করিয়াছেন যে কিছু কিছু করিয়া স্বায়ত্তশাসনের অধিকার এদেশবাসীদিগকে দেওয়া হইবে এবং যখন সাম্রাজ্যের স্থিতি ও সংরক্ষার জন্য কিছু কিছু করিয়া রাজ্যশাসনের দায়িত্ব এদেশবাসীদিগকে দেওয়া কর্ত্তব্য, তখন কি যুবকবৃন্দকে সমগ্র ভারতের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সাধারণ জনমতকে পদদলিত করিয়া অবরুদ্ধ রাখা যুক্তিসঙ্গত ?"

আংগ্লো ইণ্ডিয়ানদের আন্দোলন সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন— "যদি শ্বেতাঙ্গগণ এদেশে আসিয়া বাস করিতে চাহেন, তাহা হইলে আমরা ভারতের উন্নতি সাধনের জন্য তাহাদিগের সহিত একত্র কার্য্য করিব। কিন্তু যদি শুধু অর্থ উপার্জ্জন করিতে তাঁহারা আসিয়া থাকেন এবং কেমন করিয়া অধিক উপার্জ্জন হইবে ইহাই যদি তাঁহাদের লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে তাঁহারা ভারতের বন্ধু নহেন, আপনাদিগকে ভারতবাসী বলিবার অধিকার তাঁহাদের নাই এবং এ দেশবাসীদিগকে স্বায়ত্তশাসন দিতে বাধা দিবারও অধিকার তাঁহাদের নাই। শ্বেতাঙ্গগণ ভারতবর্ষে থাকা যদি ক্ষতিকর মনে করেন তবে তাঁহারা ভারত হইতে চলিয়া

যাইতে পারেন, আর যদি থাকা লাভজনক মনে করেন তবে থাকুন, কেহ আপত্তি করিবে না।"

আংগ্লো ইণ্ডিয়ানদিগের একটি সভায় আর্ডেন উড সাহেব বলিয়াছিলেন—এইরূপ রাজনীতিক অধিকার ভারতবাসীকে দেওয়া হইলে এমন সময় আসিবে যখন ইংরাজদিগকে এদেশ ছাড়িয়া যাইতে হইবে অথবা পুনরায় ভারতবর্ষকে জয় করিতে হইবে। এ সম্বন্ধে চিত্তরঞ্জন তাঁহার বক্তৃতায় বলেন—"কথাটা শুনিলে মনে হয় না উড সাহেব ইহা সত্যই বিশ্বাস করিয়া বলিয়াছেন। ভারতবর্ষে থাকা ক্ষতিকর মনে করিলে তাহারা চলিয়া যাইতে পারে, আর লাভজনক মনে করিলে থাকিতে পারে, কিন্তু প্রয়োজন হইলে ভারতবর্ষ আবার জয় করিব এমন হাসির কথা যেন না বলে। * * * আর্ডেন উড সাহেবের যেন মনে থাকে ভারতবর্ষ কখনও অস্ত্রের দ্বারা জয় করা হয় নাই, কেবল প্রীতির দ্বারা এবং ভারতবর্ষকে সুশাসনে রাখিবে এই প্রতিশ্রুতির দ্বারাই ইংরাজেরা ইহাকে লাভ করিয়াছে। ভারতকে কখনও অস্ত্রের দ্বারা জয় করা হয় নাই; এবং ভগবান্ করিলে কখনও করিতেও কেহ পারিবে না।"

ভারতভূমিকে যাঁহারা আপনাদের আবাসভূমি বলিয়া গ্রহণ করিয়া নিয়াছেন, যেমন মুসলমানগণ ও পার্সীগণ, ভারতবাসী তাঁহাদিগকে সাদরে ভ্রাতার ন্যায় আলিঙ্গন প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু সোনার ভারতকে যাঁহারা লুণ্ঠনের সামগ্রী বলিয়া মনে করেন ভারতবাসী কোন্ প্রাণে তাঁহাদিগকে আহ্বান করিয়া

লইবে? যদি ভারতপ্রবাসী ইংরেজগণ ভারতভূমিকে নিজেদের আবাসভূমি বলিয়া গ্রহণ করিতে রাজি হন, তবে আমরা তাঁহাদের সঙ্গে একযোগে ভারত সাম্রাজ্যের উন্নতির জন্য কার্য্য করিব। কিন্তু যদি ভারতের অর্থই তাঁহাদের একমাত্র প্রলোভনের বিষয় হয়; তবে তাঁহারা ভারতের মহাশত্রু। কেহ কেহ মনে করেন বুঝি চিত্তরঞ্জন ঘোরতর ইংরেজ বিদ্বেষী। একথা যে নিতান্ত অমূলক তাহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। সমগ্র ইংরেজ জাতির উপর তাঁহার কোন বিদ্বেষভাব নাই—তবে তিনি বর্ত্তমান ভারতের ইংরেজ শাসনকর্ত্তাদের শাসনপ্রণালীর বিরোধী। তিনি আমলাতন্ত্রেরই ঘোরতর বিরোধী—তাহা ইংরাজদের হউক, আংগ্লো ইণ্ডিয়ানদেরই হউক অথবা ভারতবাসীদেরই হউক। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন—

"আমরা আমলাতন্ত্র চাই না আমরা চাই স্বায়ত্তশাসন। এই স্বায়ত্তশাসনে দেশের লোকেরই কর্ত্তৃত্ব থাকিবে এবং দেশের লোকের জন্যই প্রতিষ্ঠিত হইবে—ইহাতে প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদার হইতে নিঃস্ব প্রজা সকলেরই অধিকার থাকিবে।"

১৯১৭ সালের আগষ্ট মাসের ঘোষণা অনুসারে সংশোধিত রাজ্যশাসন প্রণালী সম্বন্ধে দেশবাসী কি কি পরিবর্ত্তন প্রয়োজন মনে করেন ইহা জানিবার জন্য বিলাত হইতে ষ্টেট সেক্রেটারী আসিয়া বড়লাটের সহিত স্থানে স্থানে পরিভ্রমণ করিবেন ও জনসাধারণের মতামত জানিবেন এইরূপ স্থির হয়।

ভারতবর্ষে রাজনীতিক ব্যাপার লইয়া দুইটি দলের সৃষ্টি হইয়াছে, একদল বলেন ভারতবাসিগণ এখনও পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন লাভের যোগ্য হয় নাই—তাহাদিগকে ব্রিটিশ শাসনের অধীন থাকিয়া একটু একটু করিয়া অধিকার লাভের দ্বারা ক্রমে ক্রমে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন পাইবার যোগ্য হইবে। ইহারা নরমপন্থী বা মদরত নামে অভিহিত। অপর দল বলেন ভারতবাসী বর্ত্তমান সময়েই স্বায়ত্ত শাসন লাভের যোগ্য তাহাদিগকে অবিলম্বে স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হউক ইহারা গরমপন্থী বা জাতীয় দল নামে অভিহিত—আমাদের দেশপ্রাণ চিত্তরঞ্জন এই জাতীয় দলভুক্ত। দেশের সমস্ত রাজনীতিক সভা সমিতিগুলি যাহাতে পূর্ণ স্বায়ত্ত শাসনের দাবি করে এই উদ্দেশ্যে স্থানে স্থানে বক্তৃতার বন্দোবস্ত করার প্রয়োজন হয়। কলিকাতার লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল ব্যারিষ্টার ও নেতৃগণ অর্থোপার্জ্জনের ক্ষতি হইবে বলিয়া কলিকাতা পরিত্যাগ করিতে চাহেন না। কিন্তু দেশপ্রাণ চিত্তরঞ্জন এই উদ্দেশ্যে ময়মনসিংহ, ঢাকা, চট্টগ্রাম, বরিশাল প্রভৃতি স্থানে বক্তৃতা দিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। বারিষ্টারিতে যাঁহার মাসিক আয় প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার টাকা তাঁহার পক্ষে ইহাতে যে বিশেষ আর্থিক ক্ষতি হইয়াছিল ইহা বলাই বাহুল্য, কিন্তু দেশের কাজে এইরূপ ক্ষতি চিত্তরঞ্জন কখনও গ্রাহ্য করেন নাই। যে স্বদেশপ্রীতির বীজ বাল্য হইতেই চিত্তরঞ্জনের হৃদয়ে উপ্ত ছিল, জীবনের নানাবিধ সংগ্রামের ও ত্যাগের ভিতরে দিয়া তাহা অঙ্কুরিত হইয়া বিশাল বিটপীতে পরিণত হইবার অবসর

পাইয়াছে। তাই সর্ব্বস্বত্যাগী চিত্তরঞ্জন আজ দেশের কল্যাণ কামনায়, দশের মঙ্গলের জন্য সম্পূর্ণরূপে নিজেকে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছেন। স্বদেশভক্তি তাঁহার ধর্ম্ম, দেশ প্রেম তাঁহার অর্থ, দেশজননীর সেবা তাঁহার মোক্ষ। তিনি ময়মনসিংহে বক্তৃতায় বলিয়াছেন—"দেশের কাজ আমার ধর্ম্মের অঙ্গ। ইহা আমার জীবনের আদর্শ। আমার দেশের কল্পনায় আমি ভগবানের মুর্ত্তির বিকাশ দেখিতে পাই।" সম্পূর্ণরূপে পাশ্চাত্য শিক্ষার মধ্যে বর্দ্ধিত হইয়াও তিনি ভারতের চিরন্তন আদর্শ হইতে কখনও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েন নাই। তিনি পূর্ব্বোক্ত বক্তৃতার একস্থলে বলিয়াছেন—"অবশ্য ইউরোপীয় সভ্যতাকে আমি শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া থাকি, আমার শিক্ষা দীক্ষার জন্য আমি ইউরোপের নিকট কৃতজ্ঞ, কিন্তু তাহা হইলেও আমি ভুলিতে পারি না যে ইউরোপীয় রাজনীতির ধারকরা জিনিস লইয়া আমাদের জাতীয়তা সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না।"

১৯১৭ সালের ১১ই অক্টোবর তারিখে ঢাকা নগরীতে একটি সভায় বক্তৃতা দিতে গিয়া তিনি বলিয়াছিলেন—

"স্বায়ত্তশাসন ব্যাপারে গভর্ণমেণ্ট আমাদিগকে কতটুকু অধিকার দিবেন এবং কতটুকু দিবেন না এ সমস্ত ভাবিবার আমাদের প্রয়োজন নাই। দেশের মঙ্গলের জন্য আমাদিগের যতটুকু অধিকার প্রয়োজন আমাদিগকে ততটুকুই দাবি করিতে হইবে, গভর্ণমেণ্ট দিবেন কি না তাহা ভাবিবার আবশ্যকতা নাই। আপনারা ভীত হইয়া কোনও কাজ করিবেন না, দেশের মঙ্গলের

জন্য যেরূপ শাসন বিধি প্রয়োজন মনে করেন তাহাই গভর্ণমেণ্টের নিকট নির্ভয়ে উপস্থিত করিতে হইবে। * * * শ্বেতাঙ্গগণ বলেন আমাদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার নাই, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম, ভিন্ন ভিন্ন জাতি এবং ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থ বিদ্যমান রহিয়াছে সুতরাং আমরা স্বায়ত্তশাসন পাইবার নাকি উপযুক্ত নই। তাহার উত্তরে আমি বলিতে চাই এইরূপ ভিন্ন ধর্ম্ম ভিন্ন সমাজ ও বিভিন্ন স্বার্থের লোককে একতাবদ্ধ করিতে হইলে এবং সর্ব্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার করিতে হইলে তাহাদিগকে একত্র হইয়া একই মঙ্গল উদ্দেশ্য সাধনের সুযোগ দিতে হইবে সুতরাং আমাদের ধর্ম্মগত, জাতিগত ও স্বার্থগত বৈষম্য ও অনৈক্য দূর করিতে হইলে সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনই একমাত্র উপায়।"

এই পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের স্বরূপ লইয়া জাতীয় দল ও মদরত দলের মধ্যে বিশেষ মনোমালিন্য চলিতেছিল। ১৯১৭ সালের কলিকাতা কংগ্রেসের সভাপতি মনোনয়ন ব্যাপারে জাতীয় দল ও মদরত দলের এই মনোমালিন্য তুমুল সংঘর্ষের সৃষ্টি করিল। জাতীয় দল শ্রীমতী আনি বেসেণ্টকে ও মদরতদল মাননীয় মামুদাবাদের রাজাকে সভাপতি করিতে চাহেন, কিন্তু পরিশেষে জাতীয় দলেরই জয় হইল—শ্রীমতী আনি বেসেণ্টই নেতৃত্বেবৃত হইলেন। এই ব্যাপারেও দেশবাসীর উপর চিত্তরঞ্জনের কতটুকু প্রভাব তাহা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

চিত্তরঞ্জন ১৯১৭ সালে বরিশালে এক বক্তৃতায়—স্বায়ত্ত-শাসনের স্বরূপ বর্ণনা করেন, দেশবাসী কেমন ধারা স্বায়ত্তশাসন

চায় তাহার একটু আভাস দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন—"ইহা হিন্দুদিগের স্বায়ত্তশাসন হইবে না, মুসলমানদিগের স্বায়ত্ত-শাসন হইবে না, জমিদারদের স্বায়ত্তশাসন হইবে না, ইহা হইতে সমগ্র বাঙ্গালার প্রজাতন্ত্রের স্বায়ত্তশাসন, ইহাতে সকলের স্বার্থ সমানভাবে রক্ষিত হইবে এবং যাহারা সমাজে প্রপীড়িত, তাহাদের বলিতে হইবে এমন স্বায়ত্তশাসন যত শীঘ্র স্থাপিত হয় ততই তাহাদের পক্ষে মঙ্গলজনক এই দারিদ্র্য পূর্ণ শাসন প্রণালীতে তাহাদের নিকট যে ক্ষমতা আসিবে তাহাতে তাহারা সকল অত্যাচার রোধ করিতে পারিবে। যতদিন না এইরূপ স্বায়ত্ত-শাসন প্রচলিত হয় যাহাতে বাঙ্গালাদেশের প্রত্যেক সমাজের সকল স্বার্থ সমানভাবে রক্ষিত হইবে, ততদিন বাঙ্গলা দেশ শান্ত থাকিবে না।"

লর্ড মিণ্টোর শাসনকালে ভারতবর্ষে শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা করিয়া গভর্ণমেণ্ট যে কতকগুলি কঠোর আইন প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তখন হইতেই চিত্তরঞ্জন সমগ্র দেশব্যাপী আন্দোলনে আপনার শক্তি নিয়োজিত করেন। ভারতসম্রাট ও তাঁহার মন্ত্রিসভা আমাদিগকে যে আশার বাণী পাঠাইয়াছিলেন, সেই আশা যাহাতে ফলবতী হয় এইজন্য আমাদিগকে কঠোর শান্তিপূর্ণ সংগ্রাম করিতে হইবে। তিনি স্পষ্টই একটি বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন—ভারতসম্রাট ও মন্ত্রিসভা যে আদর্শের কথা বলিয়াছেন তাহার জন্যই আমরা আন্দোলন করিতেছি; তাঁহারাই যে শাসনবিধি প্রচলন করা

উচিত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন তাহার জন্যই আমাদের প্রাণপণ চেষ্টা।”

১৯১৮ সনে বিলাতে কংগ্রেসের প্রতিনিধি পাঠাইবার উদ্যোগ করা হয়। সেই উপলক্ষে কলিকাতার এক সভায় চিত্তরঞ্জন বলেন—“অতি অল্পকালের মধ্যেই এমন কি এক বা দুই বৎসরের মধ্যেই আমাদিগকে জনসাধারণের নিকট দায়িত্বপূর্ণ স্বায়ত্তশাসন লাভ করা নিতান্ত প্রয়োজন নতুবা আমাদের জাতীয় জীবন নষ্ট হইয়া যাইবে। আমরা গত ৩০ বৎসরের অভিজ্ঞতার ফলে এই বুঝিয়াছি যে আমলা-তন্ত্র গভর্ণমেণ্ট আমাদিগকে এমন কিছু দিবে না যাহাতে দেশের শাসন সম্বন্ধে আমাদের প্রকৃত অধিকার থাকিতে পারে। গত ৩০ বৎসরের মধ্যে যে কোন শাসন সংস্কারের প্রস্তাব উপস্থিত হইয়াছে তাহাতেই এই আমলা-তন্ত্র বাধা জন্মাইয়াছে ও সংস্কারের পথ রুদ্ধ করিয়াছে। সুতরাং আমলা-তন্ত্রের নিকট হইতে কোনরূপ রাজনীতিক অধিকার পাইবার আশা বৃথা। আমাদিগকে আমলা-তন্ত্রের পরিচালকদের নিকট যাইতে হইবে। ব্রিটিশ জনসাধারণের নিকট আমাদের ন্যায্য দাবি উপস্থিত করিতে হইবে। * * * * আমাদের স্বায়ত্তশাসন লাভের বিরুদ্ধে আপত্তিগুলি শুনিলেও ধৈর্য্য রক্ষা করা কঠিন। তাহারা বলে যে আমরা এ পর্য্যন্ত স্বায়ত্তশাসনের উপযুক্ত শিক্ষা পাই নাই। আমি বলিব ইহা কাহার দোষ? ১৫০ বৎসর যাবৎ তোমরা রাজ্য শাসন করিতেছ তথাপি দেশের লোকই যাহাতে দেশ শাসন করিতে পারে তাহাদিগকে এতটুকু

শিক্ষিত করিতে পার নাই? আমরা কি জানি না যে জাপান মাত্র ৫০ বৎসরের মধ্যেই এত উন্নতি করিয়াছে? তোমরা ত ১৫০ বৎসর রাজত্ব করিলে, তবুও আজ কেন এই কথা বল যে আমরা স্বায়ত্তশাসনের উপযুক্ত নই?"

১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতগভর্ণমেণ্ট ভারতরক্ষা বিধি সম্বন্ধে আন্দোলনের প্রকৃত তথ্য ও তাহার প্রতিকারোপায় নির্দ্ধারণের নিমিত্ত বিলাতের কিংস্ বেঞ্চডিভিসনের জজ অনারেবল্ মিঃ জষ্টিস্ রাউলাটের নেতৃত্বে এক কমিশন নিয়োগ করেন। কমিসনের সদস্যগণ সমগ্র ভারতের রাজনীতিক অবস্থা ও রাজদ্রোহের ইতিহাস আনুপূর্ব্বিক আলোচনা করিয়া এক সুদীর্ঘ রিপোর্ট দাখিল করেন। এই সময়ে ইউরোপের মহাসমর শেষ হয়। কাজেই সন্ধিপত্র সাক্ষরিত হইবার ছয়মাস পরে, ভারতরক্ষা আইন পরিত্যক্ত হইলে, হয়ত রাজদ্রোহিগণকে আটক রাখা অসম্ভব হইবে, এই আশঙ্কায় গভর্ণমেণ্ট রাউলাট কমিশনের রিপোর্ট অনুসারে দুইটি বিল ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় পেশ করেন। এই দুইটি বিল সাধারণ লোকের নিকট "রাউলাট বিল" নামে পরিচিত। বিল দুইটি মোটামুটি এই, বড়লাট ও তাঁহার সভা ইচ্ছা করিলে বৃটিশ ভারতের যে কোন স্থানে যে কোন সময়ের জন্য ভারতরক্ষা বিধির প্রায় অনুরূপ ক্ষমতা প্রাদেশিক শাসকগণের হস্তে ন্যস্ত করিতে পারিবেন; অর্থাৎ ঐ আইন বলে যে কোন ব্যক্তিকে বিনা বিচারে আটক রাখিবার অধিকার প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের হাতে থাকিবে এবং দ্বিতীয় রাউলাট বিলের

দ্বারা ভারতীয় ফৌজদারী আইনের বাঁধন আরও দৃঢ় করা হইবে।

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে প্রস্তাবিত বিল দুইটির বিরুদ্ধে সারা ভারতে তুমুল আন্দোলন পড়িয়া গেল। কলিকাতা, বোম্বাই, মান্দ্রাজ, লাহোর, এলাহাবাদ, নাগপুর প্রভৃতি নানা জনবহুল সহরে রাউলাট বিলের বিরুদ্ধে বিরাট প্রতিবাদ সভা আহূত হইতে লাগিল। সকলেই বলিতে লাগিলেন উহা মানবের ন্যায্য স্বাধীনতার মূলমন্ত্রের বিরোধী এবং মানুষের সহজাত অধিকারের পরিপন্থী।

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে সমগ্র ভারতবর্ষের ঘোরতর প্রতিবাদসত্ত্বেও এবং ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় বেসরকারী সদস্যগণের শেষ পর্য্যন্ত প্রাণপণ বিরোধ অবহেলা করিয়াও ভারত-গভর্ণমেণ্ট রাউলাট বিল আইনে পরিণত করিলেন। ভারতের জনসাধারণ মর্ম্মাহত হইল। চারিদিকে বিপুল আন্দোলন ও বিক্ষোভ দেখা দিল। ব্যবস্থাপক সভার কতিপয় সদস্য পদত্যাগ করিলেন। এবার শ্রীযুক্ত গান্ধী রাউলাট বিলের বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত মর্ম্মে সত্যাগ্রহ প্রচার করিলেন,—

"যে বিল দুইটি আইনে পরিণত হইল, উহা স্বাধীনতাও ন্যায় বিচারের পরিপন্থী এবং মানুষের সহজাত অধিকারের ধ্বংস সাধক। মানুষের ব্যক্তিগত স্বাভাবিক অধিকারের উপর জাতির ও রাজ্যের মঙ্গল নির্ভর করে। অতএব আমরা প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক বলিতেছি যে যতদিন না ঐ আইন প্রত্যাহৃত হইবে ততদিন

আমরা উহা নিরুপদ্রবে অমান্য করিব। উহা ছাড়া অপর যে কোন আইন অমান্য করা প্রয়োজন বলিয়া মনে হইবে, তাহাও ভদ্রভাবে লঙ্ঘন করিতে আমরা পশ্চাৎপদ হইব না ”

আইন পাশের অত্যল্পকাল পরেই মার্চ্চ মাসে শ্রীযুক্ত গান্ধী এই মর্ম্মে ঘোষণা করিলেন যে রাউলাট আইন যে দিন পাশ হইয়াছে, তাহার পরবর্ত্তী রবিবারে জনসাধারণ উপবাস দ্বারা নিজের নিজের ধর্ম্ম অনুসারে ভগবানের নিকট যেন দুঃখ প্রকাশ করেন, পূজা অর্চ্চনাদি করেন। “সত্যাগ্রহ” পালনের দিন বলিয়া সেই দিন সর্ব্বত্র দোকান পাট যেন বন্ধ থাকে। “সত্যাগ্রহ” ব্রত পালনের জন্য জনসাধারণের মধ্যে একটা সাড়া পড়িয়া গেল।

এই সময়ে চিত্তরঞ্জন “সত্যাগ্রহ” পণ গ্রহণ করেন। পূর্ব্বেই দেখিয়াছি চিত্তরঞ্জন প্রথম হইতেই বড় ভাবপ্রবণ, তাই যখন এই নূতন ভাবের ঢেউ উঠিল তখন তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না। ২৩ শে চৈত্র ১৩২৫ সনে সত্যাগ্রহ সম্মেলনের বিরাট জনসংঘের সম্মুখে কলিকাতা গড়ের মাঠে তিনি সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেন—

“আজ মহাত্মা করমচাঁদ গান্ধীর দিন। আজ বাঙ্গালীর হৃদয়ের বেদনা প্রকাশ করিবার দিন। আনন্দের দিনে আমরা আত্মহারা হইয়া যাই; কিন্তু দুঃখের দিনে আপনাকে দেখিতে পাই ও ভগবানের বাণী শুনিতে পাই।

আজি এই জাতির বিপদের দিনে এই জাতির যে আত্মা তাঁহাকেই অনুসন্ধান করিব। “নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ”।

কিন্তু এই বল কিসের বল? পাশব বলে আত্মাকে পাইব না। এই বল প্রেমের বল। ইহাই মহাত্মা গান্ধীর বাণী, আর ইহাই, সমগ্র ভারতের বাণী। এই বাণীকে সার্থক করিতে হইলে, সকল স্বার্থপরতাকে, সকল হিংসা ঘৃণা, বিদ্বেষকে বিসর্জ্জন করিতে হইবে। আমরা রাউলাট আইনের বিরুদ্ধে কেন আন্দোলন করি? আমরা বুঝিতে পারিয়াছি যে রাউলাট আইন চলিলে আমাদের এই নব জাগ্রত জাতিটাকে তাহার নিজের পথ ধরিয়া গড়িয়া তুলিতে বাধা প্রাপ্ত হইব। সেই বাধা অতিক্রম করিতে হইলে, সকল হিংসা দ্বেষ বর্জ্জন করিয়া দেশ প্রেমকে জাগাইয়া রাখিতে হইবে। তাই মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন, শত্রুকে ঘৃণা হিংসা করিবে না; কারণ প্রেমের জয় অনিবার্য্য। * * * ইহা প্রেমের আন্দোলন, ধর্ম্মের আন্দোলন, আমাদের জাতীয় জীবনের স্পন্দন। এই আন্দোলনকে সফল করিবার একমাত্র উপায় আত্মনিবেদন। সকল শাস্তি, সকল আপদ বিপদকে তুচ্ছ করিয়া প্রাণের অনুরাগে আত্ম নিবেদন।"

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে ৩০শে মার্চ্চ তারিখে দিল্লী নগরীতে "সত্যাগ্রহ" পালন উপলক্ষে ভীষণ ব্যাপার অনুষ্ঠিত হয়। দলে দলে নগর-বাসীরা সত্যাগ্রহ পালন করিতেছিলেন, সেই ব্যাপারে পুলিশ আসিয়া নগরের লোকদিগের সহিত গোল বাধায়। তাহার ফলে যে ভীষণ ব্যাপার অনুষ্ঠিত হয়, তাহা চিরদিন ইতিহাসের পৃষ্ঠায় লিখিত থাকিবে। বহু নিরীহ নগরবাসী এই সংঘর্ষের ফলে আহত ও নিহত হয়। অবশেষে নগরীতে শান্তিস্থাপনের জন্য

কর্ত্তৃপক্ষ কামান পাতিয়া গোরা সৈন্যের নিয়োগ করিয়াছিলেন। এই ব্যাপার উপলক্ষে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ মুসলমানের মসজিদে বক্তৃতা দিবার জন্য আহূত হন। ইতিহাসে এই ঘটনা চিরস্মরণীয় থাকিবে।

সত্যাগ্রহ ব্যাপার উপলক্ষে ৯ই এপ্রিল তারিখে শ্রীযুক্ত গান্ধী দিল্লী যাত্রা করেন। পঞ্জাব সরকার ইতিমধ্যে ঘোষণা করিয়া দেন যে, পঞ্জাব দেশের প্রথম অবস্থানুসারে পঞ্জাব সরকারের বিনা অনুমতিতে কোনও জন নায়ক সে অঞ্চলে প্রবেশ করিতে পাইবেন না। গান্ধী সত্যাগ্রহ অবলম্বন করিয়াছিলেন কাজেই তিনি দিল্লীর দিকে অগ্রসর হইলেন। পঞ্জাব গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে বোম্বাই প্রদেশে পাঠাইয়া দিবার জন্য পথের মধ্যে তাঁহাকে ট্রেণ হইতে নামাইয়া বোম্বাইগামী গাড়ীতে চড়াইয়া দিলেন। মহাত্মা গান্ধী ধৃত হইয়াছেন এই সংবাদ প্রচারিত হইলে পঞ্জাব ও আমেদাবাদের জন জনসাধারণ উত্তেজিত হইয়া উঠিল। সকল স্থানে হরতাল চলিতে লাগিল। হরতাল করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ পঞ্জাবীগণ বিরাট্ সভার অধিষ্টান করেন। আমেদাবাদ ও কলিকাতাতেও এই ব্যাপার উপলক্ষে কিছু কিছু অনর্থ ঘটিয়াছিল। অনেক নিরস্ত্র ও নিরীহ নগরবাসী গোরা সৈন্যের দ্বারা আহত হইয়াছিল। কিন্তু পঞ্জাবের ব্যাপারই সকলের অপেক্ষা গুরুতর হইয়াছিল। জালিয়ান ওয়ালাবাগে জেনারল ডায়ার প্রমুখ ইংরাজ সেনানীর পাশবিক আদেশে যে অগ্নিধারা বর্ষিত হইয়াছিল, তাহাতে বহুশত পঞ্জাবী হতাহত হয়। সামরিক বিধান সে

অঞ্চলে প্রবর্ত্তিত হয়। তাহার ফলে পঞ্জাবে যে অনর্থ ঘটিয়াছিল, তাহা পঞ্জাব সরকার রুদ্রনীতি অবলম্বন করিয়া দমন করিয়াছিলেন, সে সব ঘটনা ভারতের বুকের রক্ত দিয়া লিখা কাহিনী হইয়া রহিয়াছে। এই পাশবিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে যখন সারা ভারতে তীব্র আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছিল, সেই সময় স্বদেশভক্ত চিত্তরঞ্জন নিজের সমস্ত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া সুদীর্ঘ চারিমাস কাল ব্যাপী অক্লান্ত পরিশ্রমে এই ব্যাপারের তদন্তে নিযুক্ত হয়েন। তাঁহার স্বাস্থ্য তখন ভগ্ন, কিন্তু সে দিকে লক্ষ্য না করিয়া প্রচুর অর্থের ক্ষতি স্বীকার করিয়া মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ দেশনায়কগণের সাহায্যে তদন্তের যে বিবরণ প্রকাশ করেন, তাহাতে সমস্ত জগৎ শিহরিয়া উঠে। সংবাদপত্রে বিরাট আন্দোলন চলিতে লাগিল। অনুসন্ধানে উক্ত হত্যাকাণ্ড ও অনাচারের বীভৎসতা ক্রমে ক্রমে লোকের মুখে মুখে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। পঞ্জাবের ব্যাপারে সমগ্র ভারতবর্ষ বিস্ময় ক্ষোভ ও ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিল। দেশব্যাপী এই বিরাট চাঞ্চল্যস্রোত ক্রমে ইংলণ্ডের তটপ্রান্তে আসিয়া পৌছিল। বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষ আর নিশ্চিন্ত থাকা যুক্তি সঙ্গত বিবেচনা করিলেন না। তাঁহারা লর্ড হাণ্টারের নেতৃত্বে হাণ্টার কমিটি নামে পরিচিত একটা তদন্ত সমিতি গঠন করিয়া ব্যাপারটির অনুসন্ধানের ভার উহার উপর অর্পণ করিলেন। এদিকে জাতীয় দলের পক্ষ হইতেও একটা অনুসন্ধান সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল। অমৃতসরে জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশনের পর পঞ্জাবের জালিয়ানাওয়ালাবাগের

অত্যাচার সম্বন্ধে সরকার পক্ষের হাণ্টার কমিটির বিবরণ ও জাতীয় মহাসমিতির পক্ষের একখানি বিবরণ প্রকাশিত হইল। দেশের লোক উভয় পক্ষেরই বিবরণ পাঠ করিয়া স্তম্ভিত হইল।

এই পঞ্জাবের ব্যাপার চারিটি কারণে ভারতবাসীর মনে একটা বিজাতীয় অসন্তোষ ও অসহায় নিরাশ ভাবের সৃষ্টি করিল। প্রথম হাণ্টার কমিটির দেশীয় ও বিদেশীয় সভ্যদিগের মধ্যে মতভেদ এবং কমিটির বিবরণে বিদেশীয়দিগের নির্লজ্জ পক্ষপাতিত্ব; দ্বিতীয়, ডায়ার প্রমুখ অত্যাচারীদিগের শাস্তি হইতে অব্যাহতি, তৃতীয়, পার্লামেণ্টের লর্ডসভায় ডায়ার প্রভৃতির কার্য্যের নির্লজ্জ অন্যায় অনুমোদন এবং সর্ব্বশেষে ডায়ারের পুরস্কারস্বরূপ বিলাতে ও ভারতে ইংরাজদিগের প্রচুর অর্থদান। এদিকে ইউরোপের মহাসমরের অবসানে তুর্কীর সহিত সন্ধির ব্যাপার লইয়া মিত্রপক্ষ যে সর্ত্তে তুর্কীর সহিত মৈত্রী করিতে সন্মত হইলেন, তাহাতে সমগ্র মুসলমান সমাজ চঞ্চল হইয়া উঠিল। প্রথমে এইরূপে প্রস্তাব হইয়াছিল যে তুর্কসাম্রাজ্য যুদ্ধের পূর্ব্বে যেরূপ অবস্থায় ছিল, যুদ্ধের পর তেমনি ভাবে থাকিবে। মুসলমানগণ সেই কথার উপর আস্থা স্থাপন করিয়া রুমের বাদসাহের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত যখন সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইল, তখন ভারতবর্ষের মুসলমানগণ উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। কোন কোন শ্রেণীর মুসলমানগণ দেশত্যাগ করিয়া অন্যত্র আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিলেন। "মহাজরীণ" সমস্যা প্রবল হইয়া উঠিল।

এই সময়ে মহাত্মা গান্ধী ঘোষণা করিলেন যে এই অত্যাচার ও অবিচারের একমাত্র প্রতিবাদের পন্থা সহযোগিতাবর্জ্জন নীতির অবলম্বন। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা সেপ্টেম্বর তারিখে কলিকাতায় কংগ্রেসের একটী বিশেষ অধিবেশনে লালা লাজপৎ রায়ের সভাপতিত্বে "সহযোগিতাবর্জ্জন নীতি" গৃহীত হয় এবং মহাত্মা গান্ধী সেই নীতিপালনের জন্য নিম্নলিখিত উপায় গুলি নির্দ্দেশ করেন।

(১) সম্পূর্ণ স্বায়ত্ব-শাসন ও সহযোগিতাবর্জ্জননীতি সম্বন্ধে নির্ব্বাচনাধিকারিগণকে সুশিক্ষিত করিয়া তোলা।

(২) জাতীয় স্কুল কলেজের প্রতিষ্ঠা।

(৩) সালিশী আদালতের প্রতিষ্ঠা।

(৪) সরকারী খেতাব ও অবৈতনিক চাকুরী পরিত্যাগ করা।

(৫) সরকারী লেভি ও দরবার প্রভৃতির সহিত সংস্রব না রাখা।

(৬) শ্রমজীবি সম্প্রদায়কে ট্রেড ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া।

(৭) ক্রমশঃ ইউরোপীয় ব্যাঙ্ক ও ব্যবসায় হইতে ভারতীয় মূলধন ও শ্রমজীবী সরাইয়া লওয়া।

(৮) ভারতবর্ষের বাহিরে সৈনিক, কেরাণী ও শ্রমজীবী হিসাবে কেহ সরকারী কর্ম্ম গ্রহণ না করে, সে বিষয়ে ভারতবর্ষকে নিষেধ করা।

(৯) স্বদেশী ব্রত অবলম্বন করা।

(১০) আন্দোলন সফল ও সার্থক করিবার নিমিত্ত তিলক স্বরাজ্য ফণ্ড" নামে একটি ধনভাণ্ডার গঠন করিবার জন্য বিশ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করা।

কলিকাতায় মহাসমিতির বিশেষ অধিবেশনে চিত্তরঞ্জন জাতীয় বিদ্যালয় ও সালিশী আদালত প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে আপত্তি তুলিয়াছিলেন। কিন্তু নাগপুরের অধিবেশনে মহাত্মাজীর সহিত আলোচনা করিয়া তিনি সহযোগিতা বর্জ্জন নীতির সম্পূর্ণ পক্ষপাতী হইয়া পড়িলেন এবং দ্বিতীয় দিনের বৈঠকে তিনিই সহযোগিতা বর্জ্জনের প্রস্তাব করেন। কেহ কেহ নাকি প্রথমে চিত্তরঞ্জনকে ভণ্ড ভাবিয়া টিটকারী দিতে যান, কিন্তু যখন তিনি ভাবে গদ গদ হইয়া বলিলেন যাহা আমি আজ বলিব তাহা কাল কার্য্যে পরিণত করিবই, জীবনে কখনও কথা ও কাজে আমার অমিল হয় নাই, তখন সকলে নীরব হইয়া তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিলেন। নাগপুর কংগ্রেস হইতে ফিরিয়া আসিয়া স্বদেশপ্রেমিক চিত্তরঞ্জন দেশ মাতৃকার আহ্বানে বিশাল পসার ও প্রভূত অর্থাগমের পথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই সহযোগিতা বর্জ্জন আন্দোলনে জীবন মন ও শক্তি উৎসর্গ করিয়া বাঙ্গালার নেতৃত্বের শূন্য সিংহাসন অধিকার করিয়াছেন এবং মহাত্মা গান্ধী নির্দ্দেশিত পথে আসিয়া বাঙ্গালার তরুণ প্রাণে এক নূতন আশার বাণী জাগাইয়া তুলিয়াছেন।



শেষ কথা



চিত্তরঞ্জনের জীবন দুইটি প্রবল শক্তির প্রভাবে গঠিত হইয়াছে একটি স্বামী বিবেকানন্দের সেবাধর্ম্ম অপরটি বৈষ্ণবীয় প্রেমধর্ম্ম। এই দুইটি অপূর্ব্ব শক্তি মিলিয়া তাঁহার হৃদয়কে ভাবপ্রবণ ও কুসুম কোমল করিয়া তুলিয়াছে। তাই দুঃখীর দুঃখ দেখিলে তাঁহার হৃদয় করুণায় বিগলিত হইয়াছে ; তাই তিনি শত শত সহায় সম্পদ বিহীন নিরন্নের অন্নদান করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন ; তাই অনাথ আতুরকে নারায়ণ জ্ঞানে সেবার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন। চিত্তরঞ্জন সমগ্র জীবনে সেই প্রেমিক ঠাকুরের অনুচর, ভিতরে বাহিরে খাঁটি বৈষ্ণব। তাঁহার কাব্যে তিনি বৈষ্ণব, তাঁহার সমাজ সংস্কারে তিনি বৈষ্ণব এবং শেষে তাঁহার রাজনীতিক জীবনেও তিনি শুধু বৈষ্ণব। সুতরাং তাঁহার জীবনে এই বৈষ্ণব প্রভাব দেখাইবার জন্যই আমরা তাঁহার কাব্যজীবনের সম্বন্ধে একটা আলোচনা করিয়াছি। তাঁহার সমস্ত জীবনে এই একই ভাব-গঙ্গার ধারা বহিয়া গিয়াছে। সেবাধর্ম্ম ও প্রেমধর্ম্মই তাঁহার জীবনের আদর্শ। রাজনীতিক অধিকার এই ধর্ম্মপালনের শ্রেষ্ঠ সোপান বলিয়াই তিনি ইহা গ্রহণ করিয়াছেন। যে দিন তিনি জাতীয় মহাসমিতির আদেশে ত্যাগধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, সেদিন এই ত্যাগের বিরুদ্ধে একটি চিত্র তাঁহার মনে জাগিয়াছিল, তাহা এই অনাথ আতুর দীন অসহায়ের চিত্র—কেমন করিয়া সেই

দরিদ্র নারায়ণের সেবা হইবে। এই সর্ব্বত্যাগের সংকল্প করিবার পর একদিন তাঁহার এক বন্ধু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনার অসাধারণ দানের কি হইবে, অনাথ-সেবার কি হইবে?" চিত্তরঞ্জন অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"কি করিব, এর চেয়ে যে আরও বড় কর্ত্তব্যের ডাক এসেছে, আমি ত চিরজীবী হয়ে আসিনি, যাহাদের এতকাল সাহায্য করে এসেছি তাহাদের ভগবান্ দিয়ে দিবেন। জীবনের শেষভাগে একটু দেশ-জননীর সেবা করি!"

তাই ত্যাগের জলন্ত মূর্ত্তি চিত্তরঞ্জন আজ যে ভাবে নিজের জীবন মাতৃভূমির উন্নতি সাধনে উৎসর্গ করিয়াছেন, সমগ্র ভারত তাঁহার এই অপূর্ব্ব আত্মত্যাগে বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়া গিয়াছে। তাঁহার আদর্শে তাই বাঙ্গালায় ভাবের প্রবল প্লাবন আসিয়াছে। বাঙ্গালার স্কুল কলেজের অসংখ্য ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্রব ত্যাগ করিয়া জাতীয় বিদ্যালয়ে আসিল বা গ্রামের সংস্কারে দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করিল। যখন মহাত্মা গান্ধীর বাণী বাঙ্গলার ছাত্রসমাজকে আলোড়িত করিতে পারে নাই, তখন চিত্তরঞ্জনের মহান্ আদর্শ ছাত্রসমাজকে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিয়াছে। তাহারা সহকারিতা বর্জ্জনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে।

যেদিন "মালঞ্চ" ও "সাগরসঙ্গীতে" কবি "অন্তর্য্যামী" ও "কিশোর কিশোরী"তে বৈষ্ণব কবিতার ধারা বাঙ্গালা সাহিত্যে ফিরাইয়া আনিতে প্রয়াস পাইলেন, যেদিন তাঁহার নূতন ভাবগঙ্গার ধারায় স্নান করিয়া দেশবাসী ধন্য হইল; যেদিন কর্ম্মক্ষেত্রে লক্ষ

লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিয়া অকাতরে দরিদ্র নারায়ণ সেবায় ব্যয় করিয়াছিলেন, সেদিন বঙ্গবাসী বলির দানের সঙ্গে তাঁহার দানশীলতার তুলনা করিল ; যেদিন আলিপুরের বোমার মোকদ্দমায় তিনি দেশপূজ্য অরবিন্দের পক্ষ সমর্থন করিয়া তাঁহাকে মুক্ত করিয়া আসিলেন, সেদিন ভারতবাসী তাঁহার গভীর আইন জ্ঞানে বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ আইনজ্ঞ বলিয়া প্রতিপন্ন করিল। তাহার পর যে দিন তিনি ধনসম্পদ সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া নগ্নদেহে আসিয়া পথে দাঁড়াইয়া দেশবাসীকে আহ্বান করিলেন, সেদিন সমগ্র জগৎবাসী তাঁহার এই অভূতপূর্ব্ব ত্যাগে বিস্মিত নেত্রে এই মহাপ্রাণ পুরুষের দিকে তাকাইয়া রহিল। অল্পদিন হইল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সভাপতি সার মাইকেল স্যাডলার একটি পত্রে বলিয়াছেন, "চিত্তরঞ্জনের অদ্ভুত ত্যাগ জগতের ইতিহাসে অতুলনীয় ; কোন দেশে কোন সময়ে কেহ এত অর্থ উপার্জ্জন করিয়া দেশের কাজে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে পারে নাই, ভারতবাসী তাঁহার অনুকরণ করিতে পারিলে ধন্য হইবে।"

দুই বৎসর পূর্ব্বে চিত্তরঞ্জন যখন ডুমরাঁও রাজার মোকদ্দমায় নিযুক্ত ছিলেন তখন একদিন এক সন্ন্যাসী তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন—"তোমার এই ভোগ ঐশ্বর্য্য তুমি বৎসরাধিক কাল মধ্যেই পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে" কথা শুনিয়া সকলে অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়াছিল। কে জানিত তখন যে অলক্ষ্যে থাকিয়া সেই লীলাময় ঠাকুরটিও একটু হাসিয়া লইয়াছিলেন।

তখন কে ভাবিয়াছিল সন্ন্যাসীর ভবিষ্যদ্বাণী এত শীঘ্র সফল হইবে? কে মনে করিয়াছিল ধনৈশ্বর্য্য পরিবেষ্টিত চিত্তরঞ্জন এই কঠোর জীবন বরণ করিয়া লইবেন?

যাহাকে ইংরাজিতে polit'cian বা রাজনীতিক আন্দোলনকারী বলে চিত্তরঞ্জন কোনও কালে সেইরূপ নহেন, আন্দোলনকারীর diplomatic চাল তাঁহার কখনও ছিল না এবং এখনও নাই। তিনি শুধুই ভাবপ্রবণ স্বদেশপ্রেমিক। সোণার বাঙ্গালাকে তিনি সারাজীবন প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছেন, যৌবনে সকল চেষ্টার মধ্যে তাঁহার বাঙ্গালার মূর্ত্তি হৃদয়ের মণি-কোঠায় বসাইয়া রাখিয়াছিলেন এবং আজ এই পরিণত বয়সে সে মূর্ত্তি জাগ্রৎ জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। স্বর্গীয় মহারাজ তিলক একবার চিত্তরঞ্জন সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—"আমার আশা হয় এমন একদিন আসিবে, যে দিন দেশগৌরব চিত্তরঞ্জন তাঁহার সমস্ত শক্তি স্বদেশ সেবার নিয়োজিত করিবেন, এবং তাঁহার স্বদেশ প্রীতি জলন্ত প্রদীপের মত ভারতবাসীকে পথ দেখাইয়া দিবে।" আজ লোকমান্য তিলকের আশার বাণী সফল হইয়াছে। সে দিন ও কলিকাতার ছাত্রবৃন্দের সভায় বক্তৃতা দিবার সময় মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছিলেন—"আমি জানিতাম চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বের অপেক্ষায় তোমরা বসিয়াছিলে, আমি আশা করিয়াছিলাম সে সময় শীঘ্রই আসিবে যখন তোমাদের চিত্তরঞ্জন সর্ব্বত্যাগী হইয়া দেশের কাজে ছুটিয়া আসিবেন।"

বহুদিন পূর্ব্বে "সাগর সঙ্গীতে" একদিন তিনি গাহিয়াছিলেন-

(১১৩)

"যেদিন ডাকিলে তুমি গভীর গর্জ্জনে ;
অনন্ত রাগিণী ভরা ধ্বনিতে তোমার ;
হৃদয় মন্থন করা বিপুল তর্জ্জনে
ভেসে গেল অন্তরের এপার ওপার"

এ ডাক যখন সত্য সত্যই তাঁহার প্রাণের মাঝে এসে পৌঁছিল, তখন তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না, পাগলের মত বেরিয়ে এলেন গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে দেশবাসীদের মায়ের কাজে ডেকে নেবার জন্য। বাঙ্গালা কিন্তু তাঁহার এই ডাকের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিল। তাই তিনি যখন নারায়ণগঞ্জে পৌঁছিলেন, তখন কি সে সংবর্দ্ধনা তাহা বর্ণনা করা যায় না, সেই ভাবতরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে গড়িয়া উঠিল একটি সুপ্রতিষ্ঠিত জাতীয় বিদ্যালয়। নারায়ণগঞ্জ থেকে ঢাকায় আসিয়া তিনি যেমন ডাক দিলেন, অমনি শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক সতীশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের নেতৃত্বে ছাত্রবৃন্দ কলেজ হইতে বাহির হইয়া আসিয়া জাতীয় বিদ্যাপীঠ গঠনের চেষ্টা সফল করিয়া দিল। তারপর ময়মনসিংহের মেজিষ্ট্রেটের দুর্ব্বুদ্ধিতায় যখন চিত্তরঞ্জনকে নগরে প্রবেশ করিতে নিষেধ করা হইল, তখন দেশের লোক ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল ; চিত্তরঞ্জনও আদেশ অমান্য করিবেন কি না একবার ভাবিয়াছিলেন, কিন্তু জাতীয় মহাসমিতি এতটা অগ্রসর হইবার অনুমতি দেয় নাই, তাই তিনি ফিরিয়া আসিলেন। সেই সময় তিনি দেশবাসিগণকে যে কথা শুনান, তাহার প্রতিধ্বনি এখনও আকাশে বাতাসে ছড়াইয়া বেড়াইতেছে—"আমরা আমাদের নিজের দেশে ক্রীতদাসের

মত ব্যবহার পাইতেছি, স্বরাজ না পাইলে জীবন ধারণ মিথ্যা।" মেজিষ্ট্রেটের এই নিষেধ আদেশে কাজ হইল বিস্তর; তখন প্রবেশিকা পরীক্ষা হইতেছিল, প্রায় অধিকাংশ পরীক্ষার্থী এই অবমাননার প্রতিবাদ স্বরূপ পরীক্ষা দেওয়া বন্ধ করিলেন; স্থানীয় উকিল মোক্তারগণ সাত দিনের জন্য আদালত যাওয়া স্থগিত রাখিলেন, ময়মনসিংহ ছাড়িয়া চিত্তরঞ্জন টাঙ্গাইল আসিয়া পৌঁছিলেন; সেখানকার প্রসিদ্ধ মোক্তার শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় ব্যবসায় ছাড়িয়া দেশের কাজে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, চিত্তরঞ্জন তাঁহার গৃহে থাকিয়া টাঙ্গাইলে এক বক্তৃতা দিলেন। সেই বক্তৃতা এত হৃদয়স্পর্শী হইয়াছিল যে রিপোর্ট লিখিতে যে পুলিশ কর্ম্মচারী সেখানে উপস্থিত ছিল, সেও নাকি কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল। টাঙ্গাইল হইতে করটিয়া গিয়া তিনি এক বক্তৃতা দিলেন। স্থানীয় জমিদার ওয়াজিদ আলির বিস্তৃত প্রাঙ্গণে গ্রামবাসী কৃষক শ্রমজীবীরা সব আসিয়া একত্র হইল। বদান্য জমীদার ওয়াজিদ আলি একটি জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং কৃষকদিগের সুবিধার জন্য একটি ধান্যাগার স্থাপিত হইবার প্রস্তাব হইল। ইহার পর চিত্তরঞ্জন মৌলভী বাজার ও হবিগঞ্জে বক্তৃতা দিয়া শ্রীহট্টে উপস্থিত হইলেন। শ্রীহট্টে স্থানীয় লোকেরা তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য যে বিপুল সমারোহের আয়োজন করিয়াছিল, তাহা এক লোকাতীত ব্যাপার; সে যে কি উৎসাহ, কি জয়ধ্বনি, "মহাত্মা গান্ধিকি জয়—" ও "দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের জয়" এই ধ্বনিতে

গগন বিদীর্ণ হইয়াছিল। সেখানে আসাম প্রাদেশিক খেলাফৎ সভার সভাপতিরূপে তিনি এক অতি সুন্দর অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন। তাঁহার একস্থানে তিনি বলিয়াছেন—"আজ মিলন ঊষায় পাখী ডাকিয়াছে। কত বিচিত্র সুরের মধ্য দিয়া সেই মিলন সঙ্গীতের মধুর ধ্বনি যেন আজ কাণে আসিয়া মরমে পশিতেছে, আজ সকল বৈচিত্র্যকে সার্থক করিয়া একের অখণ্ড মূর্ত্তি ভাসিয়া উঠিতেছে।" এই যে ভারতবাসীদের মিলন, ইহা ত টুটিবার নহে। আমাদের এই আন্দোলন অধর্ম্ম, অত্যাচার অন্যায়ের বিরুদ্ধে—এখানে হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান বলিয়া কিছু নহে। সেইজন্য খেলাফতে হিন্দুও যোগদান করিয়াছে। কেন এ অন্যায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিব, কেন আমরা স্বরাজ চাহিব, তাহার কারণ তিনি এই অভিভাষণে দিয়াছেন—"আমার নিজের ঘরেই যদি আত্মসম্মান বজায় রাখিয়া চলিতে না পারি, নিজের দেশেই যদি পশুর মত হইয়া থাকিতে হয়, তবে আর আমার মান, আমার ধর্ম্ম থাকিল কই? আমার আহার জুটে না, বস্ত্রাভাবে লজ্জা রক্ষা হয় না। আমার স্ত্রী-পুত্রের পদে পদে লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়—আমার দেশবাসীকে কীট পতঙ্গের মত প্রাণ হারাইতে হয়, সে কারণ স্বরাজ আমাদের চাই-ই চাই। সেখানে হিন্দু মুসলমানের কথা নয়—কথা মানুষের, কথা ধার্ম্মিকের।"

ইহার পর শ্রীহট্ট টাউন হলে তিনি একটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। উহা এমন করুণ ও প্রাণস্পর্শী যে তাহার তুলনা বাঙ্গালা ভাষায় বিরল। মনের আগুন যেন গলিয়া গলিয়া বাহির হইয়াছে,

আগ্নেয়গিরি নিঃস্রাবের মত অসহতেজে বাহির হইয়া আসিয়াছে। মানুষ একটা উদ্দাম ভাবে পাগল না হইলে এমন বক্তৃতা দিতে পারে না নিশ্চয়। পরিশিষ্টে আমরা সমস্ত বক্তৃতাটি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

শ্রীহট্ট হইতে চিত্তরঞ্জন কুমিল্লায় যখন পৌঁছিলেন, তখন গভীর রাত্রি, সে সময়েও প্রায় দশ সহস্র লোক তাঁহাকে দেখিতে ষ্টেসনে উপস্থিত ছিল। দেশবন্ধুর প্রতি এমনি তাঁদের প্রাণভরা ভক্তি, এমনি তাহাদের নূতন উৎসাহ। তারপর চট্টগ্রামে তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য ই, বি, আর কারখানার কর্ম্মচারিগণ নিজেরা স্পেশেল ট্রেণ হাঁকাইয়া "জয় দেশবন্ধুর জয়" বলিয়া সভায় আসিয়া যোগ দিয়াছিল। বাঙ্গালা রাজনীতিক ইতিহাসে ইহা একটা নূতন কথা।

সমগ্র পূর্ব্ববাঙ্গালা পরিভ্রমণ করিয়া চিত্তরঞ্জন বরিশাল প্রাদেশিক সভায় উপস্থিত হইলেন। সে সভায় তাঁহার স্বরাজের কথা কি প্রাণস্পর্শী! তিনি বলিয়াছেন, "স্বরাজ দশের কথায় চল্‌বে কি একের কথায় চল্‌বে, জানি না। স্বরাজ আমাদের জন্মগত অধিকার, ভগবানের দান। তপশ্চায় নিজেকে বোঝ, দেখ্‌রে তুমি অন্তরে বাহিরে মুক্ত; অন্তরের এই মুক্তির আস্বাদ ৩০ কোটি মানুষ পেলেই তারা মুক্ত হবে। আগে অন্তরের এই মুক্তিধন তারপর বাহিরে তার স্বতঃস্ফূর্ত্ত স্বাধীন রূপ। বিদ্যায়, বাণিজ্যে, বিচারে শাসনে আমরা পরের মুখ চাই, এই ত মায়া। আমরা কাহারও শত্রু নই, আমরা মুক্তিকামী; এই আন্দোলন

শান্তির যুদ্ধ। আমাদের মা বোনকে কাপড় পরায় বিদেশী, এ লজ্জা কি রাখবার স্থান আছে ?" এই বাণী সত্য, ইহা রাজনীতিকে এক নূতন রূপ দিবে। ইহা যে আমাদের প্রাচীন ঋষির বাণী।

বাঙ্গালা আজ জাগিয়াছে এক নূতন উষার আলোক ছটায়। বাঙ্গলার ঘুমন্ত প্রাণটি ঠিক সেই রূপকথার ঘুমন্ত রাজকুমারীর মত কত যুগ ঘুমাইয়াছিল, আশে পাশে সব জঙ্গল কাঁটায় ভরিয়া গিয়াছিল ; তারপর কোন্ শুভক্ষণে এক ত্যাগী কর্ম্মবীর রূপকথার রাজপুত্রের মত সেই কাঁটাবন ভাঙ্গিয়া সহসা সোনার কাঠি আনিয়া বাঙ্গালার ঘুমন্ত প্রাণে ছুইয়া দিল, অমনি সে জাগিল নূতন ভাবে নূতন রূপে ও নূতন আলোকে। তাই আজ আকাশে বাতাসে, হাটে মাঠে, পথে ঘাটে একই প্রার্থনা ধ্বনিত হইতেছে—

"বাঙ্গালার মাটি, বাঙ্গালার জল,
বাঙ্গালার বায়ু, বাঙ্গালার ফল,
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক,
পুণ্য হউক, হে ভগবান্!
বাঙ্গালীর পণ, বাঙ্গালীর আশা
বাঙ্গালীর কাজ, বাঙ্গালীর ভাষা
সত্য হউক, সত্য হউক,
সত্য হউক, হে ভগবান্!

পরিশিষ্ট

আসাম প্রাদেশিক খেলাফৎ সভায়

শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন দাশের অভিভাষণ

যে মহামিলনের সাগরসঙ্গমে ভারত ইতিহাসের বিভিন্ন স্রোতধারা ছুটিয়া চলিয়াছে, আজিও আমাদের সে মিলন সম্পূর্ণ হয় নাই। বিধাতার অলক্ষ্য ইঙ্গিতে ভারতীয় মহাজাতি জগতের কোন্ প্রয়োজন সাধনে গড়িয়া উঠিতেছে, একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টি লইয়া দেখিলে হয়ত আমরা তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পাইতে পারি। সভ্যতার ইতিহাসে শৈশবকাল হইতে ভারতে যত ঘটনা ঘটিয়াছে সবগুলি ভারতকে একীভূত করিতে সাহায্য করিয়াছে।

যে সুন্দর মালাটি দিয়া আমাদের জাতীয় জীবনের দেবতাকে বরণ করিতে হইবে তাহার প্রতি পুষ্পটি আজিও সংগৃহীত হয় নাই! এক একটি করিয়া শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া সেই কুসুমরাশি সংগৃহীত হইতেছে। ভারতের ইতিহাস যুগ যুগান্তর ধরিয়া সেই কুসুম চয়ন করিয়া চলিয়াছে, জানিনা কবে আমাদের পূর্ণ মিলনের মালাগাছি গ্রহণ করিয়া বিধাতা আমাদের জীবন সার্থক করিবেন।

সে মিলনউষার পাখী ডাকিয়াছে। কত বিচিত্র সুরের মধ্য দিয়া সেই মিলনসঙ্গীতের মধুর ধ্বনি যেন আজ কাণে আসিয়া

মরমে পশিতেছে, আজ সকল বৈচিত্র্যকে সার্থক করিয়া একের অখণ্ড মূর্ত্তি ভাসিয়া উঠিতেছে।

কত রাজা, রাজধানী এই ভারতে উত্থিত হইল, পতিত হইল; কত দেশ বিদেশের কত জাতি এই ভারতে আসিল। আর্য্য, অনার্য্য, শক. সিমীয়, গ্রীক, হুন, পার্শী, য়িহুদী, খৃষ্টান, মুসলমান মায়ের কোলে স্থান লাভ করিয়া স্নেহ ধন্য হইল।

এক একটা জাতি আসে, এক একটা ভাবের বন্যা আসে, মানুষের সঙ্গে মানুষের ভেদাভেদ ভাসাইয়া দিয়া সে পুণ্যস্রোত ভারতকে একতার অভিমুখে অগ্রসর করিয়া দেয়। অনার্য্যের সহিত আর্য্যের সংযোগে এক মহত্তর জাতির সৃষ্টি হইল—তারপর একে একে কত জাতি আসিয়া ভারতে প্রবেশ করিল। নিজের যাহা কিছু দিবার ছিল, তৎসমুদয় দান করিয়া জাতির মহত্তর জীবন নাশ করিয়া নিজের প্রয়োজন সার্থক করিল। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্ম, মুসলমান ও অন্যান্য ধর্ম্ম—সকলই ভারতকে একটা বৃহত্তর জীবন লাভে সাহায্য করিয়াছে। কাহাকেও নষ্ট করিয়া এই জীবন ফুটে নাই—প্রত্যেকের বৈচিত্র্যকে বজায় রাখিয়া, যথাস্থানে তাহাকে স্থাপিত করিয়া সমগ্রের সমাবেশে এক নূতন সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তুলিয়াছে। যে বাণী শুনাইয়া, যে মন্ত্রের উদাত্তসুরে জগতকে মাতাইয়া ভারতের জাতীয় জীবন সার্থকতা লাভ করিবে, এতদিন ভারত কত বিপ্লব সহিয়া যাহার জন্য প্রস্তুত হইতেছে আজ বোধ হয় সেই শুভদিনের প্রভাতীগান আরম্ভ হইয়াছে।

"শ্মশানকুক্কুরদের কাড়াকাড়িগীতি" চারিদিক মুখরিত করিয়া রাখিয়াছে, শান্তির বাণী, প্রেমের বাণী কামানের শব্দের অন্তরালে কোথায় প্রচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। কলের নিষ্পেষণে মানুষের প্রাণ আজ মরমের যাতনায় আর্ত্তনাদ ছাড়িতেছে—প্রলয়ের বেদনায় ধরিত্রী আজ অধীর হইয়া উঠিয়াছে। মরণের এই কোলাহলের ভিতর কে আজ মঙ্গলশঙ্খ ধ্বনিত করিয়া মানব স্বাধীনতার নবযুগের উদ্বোধন করিবে? সে সাধনা জগতে আর কোন্ জাতির আছে? ভারতের এতদিনের প্রতীক্ষা আজ বুঝি সফল হইতে চলিয়াছে।

বর্ত্তমান আন্দোলন সেই উদ্বোধনের পূর্ব্বে নিজের পবিত্রীকরণ। যুগযুগান্তের সঞ্চিত আবর্জ্জনারাশি আজ দূরে ফেলিয়া দিতে হইবে—নিজের মনের দেউলে নিজের দেবতার পূর্ণরূপ দর্শন করিতে হইবে। তবেইতো আমরা নববলে বলিয়ান হইয়া—মুক্তির মহামন্ত্র ঘোষণা করিয়া জগতের নূতন জীবন সঞ্চার করিতে পারিব।

আজ আমাদিগকে দেহে মনে বাক্যে শুদ্ধ হইতে হইবে; ভেদাভেদ, হিংসাদ্বেষ ভুলিয়া মিলনের সূত্রে আবদ্ধ হইতে হইবে। প্রাণের সহিত প্রাণের সত্যিকার নিবিড় আলিঙ্গনে এক হইতে হইবে। তাই আজ মায়ের নামে প্রেমের জোয়ার দেশ ভাসাইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। এ জলতরঙ্গ রোধিতে পারে জগতের এমন শক্তি নাই।

হিন্দুর সহিত মুসলমানের জাতিগত বিরোধ মুসলমান আমলে

ছিল না। টোডরমল্ল, বীরবল, যশোবন্ত সিংহ, মানসিংহ মুসলমান সম্রাটের দক্ষিণহস্ত ছিলেন। এখন হায়দরাবাদে যেখানে হিন্দু প্রজা বেশী, রাজা মুসলমান; অথবা কাশ্মীরে যেখানে মুসলমান প্রজা বেশী, হিন্দু রাজা; সেখানে হিন্দু মুসলমানের বিরোধ নাই। বিরোধের সৃষ্টি হইয়াছিল বৃটিশশাসনে। কিন্তু আজ ভারতমাতার দুটি সন্তান হিন্দু মুসলমান বুঝিয়াছে যে উভয়েরই স্বার্থ এক—বিদেশীর স্বার্থ, উভয়কে বিভিন্ন রাখা।

তাই মুসলমানের ধর্ম্মে আঘাত আজ এমন করিয়া হিন্দুর বাজিয়াছে মুসলমানের পক্ষে এইটী যেমন ধর্ম্মের কথা—হিন্দুর পক্ষেও তাই। প্রকৃত হিন্দুর ধর্ম্ম এই, কোনও ধর্ম্মকে নিপীড়ন না করা এবং নিপীড়িতকে পীড়নের হাত হইতে উদ্ধার লাভ করিতে সাহায্য করা। জগতের যে কোনও ধর্ম্মবিশ্বাসী সম্বন্ধে এই কথা প্রযোজ্য। প্রকৃত ধর্ম্মবিশ্বাস মানুষের যোগস্থাপনে সহায়তা করে। কোনও ধর্ম্মকে নষ্ট করা অপর কোনও ধর্ম্মের সার্থকতা নহে। ভগবান কত ছন্দে কত লীলায় সংসারে দেখা দিতেছেন—কত ধর্ম্ম, কত ভাবের ভিতর দিয়া নিজের মূর্ত্তি প্রকট করিতেছেন—মানব তাহা কি বুঝিবে? সে কেবল তাঁহার মহতী লীলার বিষয়ীভূত হইয়া নিজের পথে অগ্রসর হইতে চলিয়াছে।

একজনের যে ভাব, আর একজনের ঠিক তাহা নহে। বৈচিত্র্যে বিরোধ নাই। সমগ্রের সামঞ্জস্যেই সত্য শিব সুন্দরের প্রতিষ্ঠা। পরস্পরকে শ্রদ্ধার ভাবে না বুঝিলে নরমাঝে নারায়ণের এই অপূর্ব্ব লীলার কিছুই উপলব্ধি হইবে না। তাই আমাদের

পরস্পরকে বুঝার এত দরকার; এই বুঝার অভাবেই এত বিরোধের সৃষ্টি।

প্রকৃত ধার্ম্মিকের নিকট এই বিরোধ নাই—তাঁহার বিরোধ অধর্ম্মের সহিত। মৌলানা মহম্মদ আলীকে একজন পদস্থ রাজকর্ম্মচারী জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"হিন্দু মুসলমানে মিলন কি সত্য হইবে? দুই ধর্ম্ম এক তৃতীয় ধর্ম্মে মিলিত না হইলে এই মিলন কি টিকিবে?" এই কথার উত্তরে আলী সাহেব বলিয়াছিলেন—"আমাদের এই অন্দোলন অধর্ম্ম, অত্যাচার, অন্যায়ের বিরুদ্ধে—এখানে একদিকে ধর্ম্ম আর একদিকে অধর্ম্মীর দল—যুদ্ধ এই দুই দলে, হিন্দু মুসলমান, খৃষ্টান বলিয়া নহে। সেইজন্য খেলাফৎ, সেইজন্য—মুসলমানধর্ম্মস্থান রক্ষকের বিপদত্রাণের জন্য—হিন্দুও এ যুদ্ধে যোগদান করিয়াছে। যাহারা বলে ইহা একটি রাজনৈতিক চাল—তাহারা মিথ্যাবাদী। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ রাজনৈতিক চালের উপর স্থাপিত হয় না—সেটা প্রাণের জিনিষ, প্রাণের অনুভূতি প্রকৃত ধর্ম্মবিশ্বাস না হইলে আবার হয় না। অনেকে বলেন খিলাফৎ সমস্যা মিটিয়া গেলেই মুসলমানগণ এই আন্দোলন ত্যাগ করিবে। আমি এইরূপ আশঙ্কার কারণ দেখি না। মুসলমান একথা নিশ্চই জানেন যে স্বরাজ নাই বলিয়াই ইংরাজ মুসলমান সৈন্য লইয়া পবিত্র জাজিরত-উল-আরব ছিন্নভিন্ন করিয়াছে। স্বরাজ নাই বলিয়াই ইংরাজ ভারতের ৮ কোটী মুসলমানের বুকে আঘাত করিয়া তাহার পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন করিতে সাহসী হইয়াছে।

আজ যদি খিলাফৎ সমস্যা কতকটা মেটে—আমরা যদি কিছু পাই—সে পাওয়া সার্থক পাওয়া হইবে না। আজিকার অনুগ্রহের দান কালই আবার চলিয়া যাইতে পারে—ভিক্ষার দান আমরা চাই না। আমরা আমাদের প্রাপ্য যোগ্যতার দ্বারা অর্জ্জন করিয়া লইতে চাই—সেই পাওয়াই আমাদের স্থায়ী পাওয়া হইবে।

ভিক্ষুকের কবে বল সুখ,
কৃপাপাত্র হয়ে কিবা ফল ?

ভিক্ষা বৃত্তির দ্বারা আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে না। "যেচে মান" পাওয়ার কোনই সার্থকতা নাই। আমার নিজের ঘরেই যদি আত্মসম্মান বজায় রাখিয়া চলিতে না পারি, নিজের দেশেই যদি পশুর মত হইয়া থাকিতে হয়, তবে আর আমার মান, আমার ধর্ম্ম থাকিল কই ? আমার আহার জুটে না, বস্ত্রাভাবে লজ্জা রক্ষা হয় না। আমার স্ত্রী-পুত্রের পদে পদে লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়—আমার দেশবাসীকে কীট পতঙ্গের মত প্রাণ হারাইতে হয়, আমার ধর্ম্মের ইজ্জত থাকে কই ?

সে কারণ স্বরাজ

আমাদের চাই-ই চাই! বীরের মত সে স্বরাজ আমাদিগকে অর্জ্জন করিতে হইবে—মানুষের মত সে স্বরাজ আমাদিগকে ভোগ করিতে হইবে। সেখানে মুসলমান মুসলমানের ধর্ম্ম কর্ম্ম নির্ব্বিবাদে শেষ করিবে। হিন্দু হিন্দুর ধর্ম্মকর্ম্ম সাধন করিয়া শান্তির সহিত, প্রেমের সহিত, সুখের সহিত সম্মানের সহিত বসবাস করিতে পারিবে। সেখানে হিন্দু মুসলমানের কথা নয়—

কথা মানুষের, কথা ধার্ম্মিকের। তাহাতে বিরোধ নাই, অসামঞ্জস্য নাই।

এই যে খিলাফৎ কমিশনকে ডাকা হইয়াছে ইহার ভিতরকার মতলব বোধহয় হিন্দু-মুসলমানে আবার একটা বিরোধ সৃষ্টি করা। মুসলমান খেলাফৎ সম্বন্ধে যাহা চায়, তাহার কতকটা দিয়া তাহাকে বুঝানো হইবে—এই তো তোমার নালিশ মিটিয়া গিয়াছে, তুমি আর গোলমাল করিও না, হিন্দুর সঙ্গে মিলিয়া আর স্বরাজ চাহিও না।

এইরূপ কথার ভিতর কতকটা অসদুদ্দেশ্য থাকিতে পারে। অনেকে হয় তো কথাটা তলাইয়া না বুঝিয়া ভুল করিতে পারেন। তাই আমি সময় থাকিতেই সাবধান করিয়া দিতেছি।

মানুষ হইয়া পৃথিবীর উপর বাঁচিতে গেলে স্বরাজ আমাদিগকে পাইতেই হইবে। স্বাধীনতা লাভ না করিতে পারিলে আমাদের জাতীয় জীবনের উদ্দেশ্য সফল হইবে না। আগে নিজের উদ্ধার প্রয়োজন, সেই উদ্ধার না লাভ করিলে আমরা জগতকে কি করিয়া নিজের বাণী শুনাইব? সেজন্য আমাদের উদ্ধারে জগতেরও প্রয়োজন আছে।

হিন্দু মুসলমান সকলকে এক হইয়া মহা বোধনের পূজারী হইতে হইবে। ক্ষুদ্র স্বার্থ বলিদান দিয়া নিজের ধর্ম্ম রক্ষার্থে—আত্মার বল সংগ্রহ করিতে হইবে। বর্ত্তমান আন্দোলন সেই আত্মবল সংগ্রহের আয়োজন মাত্র। সেই আয়োজনে সকলের ত্রুটী ধুইয়া মুছিয়া ফেলিতে হইবে—নূতন জীবনের স্নিগ্ধ উষাতে বিধাতার আশীর্ব্বাদ মাথায় ধরিয়া গহন পথে যাত্রা করিয়া মরণকে জিনিতে হইবে।

শ্রীহট্ট টাউনহল প্রাঙ্গণে দেশ-বন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের বক্তৃতা

প্রথম কথা যা আমার মনে হচ্ছে, আজ আপনারা আমাকে এই শ্রীহট্ট নগরে কেন নিয়ে এসেছেন, কিসের জন্য এত কষ্ট করে আমার আসবার জন্য এত আয়োজন করেছেন? এমন করে আহ্বান করবার আগে প্রাণের মধ্যে কি বুঝেছেন কেন আপনারা আমাকে ডেকেছেন, কেন আমাকে সাদর নিমন্ত্রণ করে এখানে নিয়ে এসেছেন? আমি কে? কেন আমায় ডেকেছেন? এই যে দেশব্যাপী আন্দোলন, স্বরাজের জন্য যে আন্দোলনে সমস্ত জাতি সাড়া দিয়াছে—শান্তিময় সংগ্রামক্ষেত্রে দেশের সকলে নেমেচে, সেই কার্য্যের সহায়তা করবার জন্য কি আপনারা আমাকে ডেকেছেন?—না শুধু দেখবার জন্য? যেমন একটা অপূর্ব্ব জানোয়ার এলে লোক তাহাকে দেখতে যায় তেমনি একবার দেখবার জন্য? আগে তাই বুঝুন, কেন ডেকেছেন। আপনারা কি স্বরাজ চান—বাস্তবিক কি স্বরাজ চান? আমি এর উত্তর এই সভার কাছে চাই। আপনারা কি স্বরাজ চান? ('চাই' 'চাই') স্বরাজ চাইলে আপনারা ঐ কলেজে কেন ছাত্র রেখেছেন? কেন ঐ কলেজের ছাদের উপর শ্রীহট্টের কলঙ্ক নিশান এখনো উড়ছে? যে শুধু মুখে জয়ধ্বনি করে, যার অন্তরে স্বরাজের বেদনা জাগে নাই, যার অন্তর স্বরাজের ভাবে ভেজে নাই, সে কি স্বরাজ চাইতে পারে? স্বরাজ পাওয়া কি যেমন তেমন? ছুটো সভায় গেলাম,

'মহাত্মা গান্ধি কি জয়' চীৎকার করে বল্লাম তাতেই কি হলো? তাতেই কি বুঝব স্বরাজলাভ হবে? যখন দেখব আদালত শূন্যপ্রায় —উকীলেরা আদালত ছাড়ছেন, যখন দেখব স্কুল কলেজ শূন্য হয়ে গেছে—যখন দেখব যুবকেরা দলে দলে গ্রামে গিয়ে লোকের হিতসাধনে ব্রতী হয়েছেন, গ্রামে গ্রামে কৃষকের এই পরাধীনতার শৃঙ্খল যাতে ছুটে যায় তার চেষ্টা করচেন, তখনই বুঝব আপনারা স্বরাজ চান। এই জয় কিসের জয়? মহাত্মা গান্ধির জয়? মহাত্মা কে? তিনি একজন অসাধারণ ব্যক্তি সন্দেহ নাই। কিন্তু ভারত কি একজনের জয় চায়? ভারত আজ চায় ভারতের জয়। মহাত্মা গান্ধীর জয়ধ্বনিতে যখন গগন বিদীর্ণ করচি তখন মনে হয় সেই জয় এখনো আসে নাই—কিন্তু সেই জয়ের সম্ভাবনাতে আমার প্রাণ পূর্ণ হইয়া গিয়াছে তাই বলি 'মহাত্মা গান্ধি কি জয়'। যখন আপনারা কার্য্যক্ষেত্রে নামবেন—যখন স্কুল, কলেজ, আদালত শূন্য হয়ে যাবে—যখন প্রাণের অশান্ত চেষ্টা স্বরাজলাভের জন্য একাগ্র হবে—তখনই বুঝব আপনারা স্বরাজ চান; তখনই মহাত্মা গান্ধীর জয় পূর্ণ হবে। মনের মধ্যে তাহাই বুঝে দেখুন। অসার কল্পনায় মত্ত হয়ে উঠবেন না। স্বরাজ, বিনা চেষ্টায়, বিনা সাধনায় গাছের ফলের মত পড়বে না। সেই সাধনা এখনই আরম্ভ করতে হবে। যদি না করে থাকেন, যদি সেই সাধনায় সিদ্ধ হওয়ার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ না হয়ে থাকেন তবে বলি আপনাদের এ স্বরাজ চাওয়া মিথ্যা কথা—এ প্রাণের চাওয়া নয়। বিধাতার জগতে যে যা চায় সে তাই পায়। আমার জীবনে

দেখেচি আমি যখনই প্রাণ দিয়ে যা চেয়েছি তাই পেয়েছি। প্রাণের সাধনা না হলে কোন মূল্যবান জিনিষ লাভ হয় না। যখন দেখব আপনাদের এই চাওয়াটা অশান্ত পাখীর মত পাখা ঝাপটাতে থাকবে তখনই বুঝব আপনারা বাস্তবিক স্বরাজ চান। আপনারা কি স্বরাজ চান? আপনারা কেন আমাকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে এসেছেন? আপনারা না ডাকলেও আমি আসিতাম,—কেন এসেছি? আমি এখন বলব কেন আমি বাংলাদেশ ঘুরে বেড়াচ্ছি—আমি বাংলার সহরে সহরে ঘুরচি আমার হৃদয়ে একটা উদ্দাম আবেগে—যে ডাক হৃদয়ের মধ্যে শুনিতেছি সেই ডাক আমাকে ঘুরায়ে ঘুরায়ে নিচ্ছে যতদিন স্বরাজ না পাব—যতদিন এই স্বরাজের প্রতিষ্ঠা না হয়েছে ততদিন ক্রমাগত আপনাদের ডাকব—ডেকে ডেকে অস্থির করব, ততদিন আপনাদের বিশ্রাম করতে দেবনা, বৎসরের পর বৎসর, মাসের পর মাস যেখানে থাকি ক্রমাগত বলব। স্বরাজ চাই, আসুন—আমাদের প্রাণ রক্ষার জন্য, দেশের জন্য স্বরাজ চাই। অনেকে এই কথায় ভীত হয়ে উঠেন। অনেকে বলেন আমরা স্বরাজ চাই না। আমি ইহাতে ভুলব না, আমি বিরত হব না যতক্ষণ না আমি পেরেছি স্বরাজের আবেগে প্রত্যেকের হৃদয় প্লুত করতে ততক্ষণ আমি ক্ষান্ত থাকব না, আমি আজ এসেছি, আবার আসব, আপনাদের প্রাণের মধ্যে বেদনা জাগিয়ে তবে ছাড়ব।

গত ২০ বৎসর যাবৎ সামান্যভাবে দেশের কথা ভেবেছি।

কিন্তু আজ পঞ্জাবের অত্যাচার, খিলাফতের প্রতি অবিচারের পর জীবন পণ করিয়া স্বরাজের জন্য লেগেছি। আমার প্রাণে কে যেন অলক্ষ্যে লিখে দিয়েছে স্বরাজ ছাড়া জীবন রাখা বৃথা। শ্রীহট্টে কে স্বরাজ চায়? আমি চাওয়াতে এসেছি। আমি ডাক্‌ছি আসুন, দেশমাতৃকার বুকে আসুন, এই ভারতশ্মশানে কি কেউ স্বরাজের সাধনা কর্‌বে না? কে চাও স্বরাজ? ("আমি" "আমি") —তবে এস, মায়ের নামে ঐ গোলামখানা সকলে ত্যাগ কর। বল মা! যতদিন তোমার পায়ে শৃঙ্খল থাকবে ততদিন স্কুল কলেজ চাই না। আমার মায়ের পায়ে বেড়ী আমার এই শিক্ষা দীক্ষায় লাভ কি? শ্রীহট্টে কে চায় স্বরাজ? আমার ডাক্ শুনবেন্ না? আমিতো রেহাই দেব না, আমি ডেকে ডেকে হয়রাণ কর্‌ব। আবার ডাকি, মায়ের বেদনা কার প্রাণে লাগে? ('আমার' 'আমার') কে মানুষ আছ, এস। ঐ মায়ের পতাকা উড্ডীয়মান, এই পতাকার নীচে দাঁড়াও। বাংলা দেশে কি মানুষ নাই। কৈ, যে অন্ধকার দেখি? কে আছ এস, দাঁড়াও। মায়ের শৃঙ্খল ছোটাবার জন্য, এস। বাংলাদেশের কৃষক, তারা স্বরাজের মর্ম্ম বুঝে, তারা স্বরাজ চায়। বাংলাদেশের অনেক জায়গায় গিয়ে তা বুঝেছি। আর আমরা সভ্যতার নেতা, শিক্ষিত—আমরা কি স্বরাজ চাই? দেশের কৃষক আমার কাছে চিরদিন নমস্য। কত কষ্টকরে তারা ক্ষেত্র কর্ষণ করে আর আমরা তাদের কত অত্যাচার, অসম্মান করি। চাষা যে সেও তো মানুষ।

আর আমরা শিক্ষিত, আমরা কি মানুষ? কবে বুক ফুলিয়ে

বলব, আমরাও মানুষ; যে শিক্ষাদীক্ষায় আমাদের অমানুষ করেছে তা ধ্বংস করা চাই তবেই আমরা আবার মানুষ হতে পারব। Principal অপূর্ব্ব বাবু বলেছেন Destruction এর পূর্ব্বে Construction এর দরকার। আমি নাকি destroy করতে এসেছি। আমি কি ধ্বংস করতে এসেছি? যেটা আমাদের অমানুষ করেছে—যে আমাদের 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্র বুঝতে দেয় না; সেটা ধ্বংস করতে এসেছি। শিক্ষালয় কোথায়? কোন্ শিক্ষক প্রাণে বুঝে বল্‌তে পারেন তাঁরা যে শিক্ষা দিচ্ছেন তা প্রকৃত শিক্ষা? এ শিক্ষালয় দাস্তালয়—এ গোলামখানা। আমি যদি এই শৃঙ্খল মুক্ত কর্‌তে এসে থাকি তাই কি আমার অপরাধ? সেই জন্যই কি শ্রীহট্টে ছাত্রেরা আমার কথা শুনবে না? "মানুষ! মানুষ! ওরে খুঁজে দেখনা কটা মানুষ!"—মানুষ হওয়া বড়ই ভার, আমি তোমাদের কলেজের যে Principal অপূর্ব্ব বাবু তাঁর কথাই বল্‌ছিলাম, তিনি বলেন যে আমি এখানে শিক্ষা ধ্বংস করবার জন্য এসেছি, শিক্ষা প্রণালীর Continuty চাই। আমি প্রথমেই বলেছি ইংরাজী শিক্ষা লাভ করে আমাদের একটা ভুল ধারণা হয়ে গিয়েছে। আমারা মনে করি মানুষের মন যেন পায়রার খোপের মত—একটা ধর্ম্ম, একটা শিক্ষা, একটা রাজনীতি এইরূপ নানা খোপে বিভক্ত। সেটা ভুল। যেদিন দেখব বাঙ্গালী বুঝতে পেয়েছে এসমুদয় বিভাগ বস্তুতঃ বিভিন্ন নয়—তখনি বুঝব বাঙ্গালীর চৈতন্য হয়েছে। তখন কে দেখবে এইসব একমিলে নানাদিকে নিজ শক্তি প্রকাশ করবে। নানা বিষয়,

নানা থোপ—এটা বিলাতী ভুল। আমার কাছে এই যে রাজনীতি এই যে স্বরাজের বারতা নিয়ে দেশে দেশে ঘুরচি—তা ধর্ম্মের বারতা, ভগবানের বাণী। যে কার্য্য ভগবানের লীলার সহচর না হয় তা কথনো সফলতা লাভ করিতে পারে না। অপূর্ব্ব বাবু আমার বন্ধু। বিলাতে অনেকদিন একসঙ্গে ছিলাম। তাঁকে বলচি দেশময় প্রাণের যে ধারা প্রবাহিত হচ্ছে স্তায়শাস্ত্রের দুর্গ দিয়ে তা বাঁধবার চেষ্টা বিধাতার বিধানে ভেসে যাবে, কিছুই টিকবে না। Destruction এর পূর্ব্বে Construction এটা যুক্তি, না ওজর? Construction করবে কারা? শ্রীহট্টবাসী না বিলাত হতে সাহেব এসে? এই গোলামথানার থরচ দেয় কারা? ভারতবাসী। এই গোলামথানা রাখতে—গোলাম তৈরী করতে গবর্ণমেণ্ট ২০ ভাগের ১ ভাগ দেয়, বাকি সব স্কুল কলেজের ছাত্রেরা মাহিনা দিয়ে যোগায়। তোমরা যদি থরচ দিতে পার তবে কি তোমরা কলেজ তৈরী করতে পার না? তবে আগে Construction তার পর Destruction এই কথার মানে কি? এর মানে এই আমরা বেশ সুখে আছি, যতদিন না আমাদের স্কুল কলেজ হয়েছে আমরা ততদিন বেশ আরামে থাকি, যথন আকাশ হতে ঐসব স্কুল কলেজ থসে পড়বে তথন অপূর্ব্ব বাবু বলবেন গবর্ণমেণ্টের স্কুল কলেজ ভেঙ্গে যাক। এযে ভাবের ঘরে চুরি।

Construction, destruction আমি বুঝি না, আমি চাই গোলামথানা হতে ছেলেদের মুক্ত করতে। এই গোলামথানা

ভেঙ্গেপড়ুক ধ্বংস হয়ে যাক। ছেলেদের গোলামখানায় রেখে, গোলাম হতে দিও না, ইহা পাপ। যে অসত্যের প্রশ্রয় দেয় সে অপরাধী। আমাদের সুজলা সুফলা মাতৃভূমি যে আজ শ্মশান। তুমি কি দেখনা এই জাতি আর জাতি না। মায়ের পায়ের শৃঙ্খল কি চিরদিনই থাকবে? যদি তাই হয় বাঙ্গালী জাতি ধ্বংস হয়ে যাক। ধ্বংস হওয়া সেটাও ভাল। যে জাতি স্বাধীনতা জানে না, যে নিজের ভাবনা ভাবতে পারে না তার ধ্বংস হউক। মিথ্যাতর্ক, শাস্ত্রের যত আবর্জ্জনা দূর করে যখন তোমরা বল্‌তে পার্‌বে আমরা স্বাধীন তখন একমুহূর্ত্তে স্বাধীন হবে। একবার মনের মধ্যে বল, আমরা স্বাধীন !! যদি তোমার মনের মধ্যে নিজের কিছু না থাকে, যদি বিদেশীর নিকট তোমার প্রাণ ও মন বিলিয়ে দেও, তবে আল্লার পায়ে কি দিবে? তোমার মন-প্রাণ যে তোমার নয়। জষ্টিস উড্‌রফ বলছেন "This is the cultural conquest of the West." আজ ইংরেজ শুধু বাহিরে নয়, আমাদের মনকে জয় করেছে। তাই আমরা দাস অপেক্ষা আরো হীন দাস। আর এই গোলামখানার হীনদাস তৈরী হচ্ছে। যে মনে প্রাণে স্বাধীন নয়, যে নিজের মনকে নিজের অধিকারে না আন্‌তে পারে তার বিধাতাকে দিবার কিছু থাকে না। সে তা বল্লে মিথ্যা কথা। স্বরাজের কথা ভাল করে ভাব, মনের মধ্যে তোলাপাড়া কর, মিথ্যা যুক্তির প্রশ্রয় দিও না। বিধাতার বাণী শুনতে চেষ্টা কর। বিধাতার বাণী যে শুনতে চায়, সে শুনতে পায়। যদি কলেজে

গিয়ে কাণে তুলো দিয়ে থাকতে চাও তবে থাক। 'গোলামের জাতি শিখেছে গোলামী' গোলাম তো গোলামই থাকবে। আর যদি তা না চাও, তবে ঐ শুন স্বরাজের বাণী। তোমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থ বলিদান দাও। যে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হবে, মায়ের জন্য সে সেই ইচ্ছাকে বলি দাও। যার ইচ্ছা উকীল হবে সে সে সেই ইচ্ছাকে বলি দাও, যার ইচ্ছা কেরাণী হবে সে সেই ইচ্ছাকে বলি দাও, সেই অর্থের লোভ, মিথ্যা সম্মানের লোভ ভগবানের পায়ে, স্বরাজের নামে বলি দাও। আর বল স্বরাজ চাই—আমরা স্বাধীন। প্রত্যেক মনুষ্যজাতি স্বাধীন। মনে প্রাণে, সকালে সন্ধ্যায় বল আমরা স্বাধীন। আমরা কোনজাতির স্বাধীনতা হরণ করিতে চাই না, কিন্তু অন্য কোন জাতি যেন আমাদের প্রকৃতিগত উন্নতির পথ রোধ না করে। তাই বল, আমরা স্বাধীন। যারা বল্লেন আমরা স্বাধীন তারা স্বার্থ বলিদান দিন, মায়ের নামে জয়ধ্বনি হউক, বল 'মায়ের জয়'! যারা আমাদের দেশের নেতা, কোর্টে যারা যান, তারা কি স্বার্থ বলিদান দিবেন না? তাদের কাণে কি মায়ের ডাক পৌছে না? এই কয়টা মাসের কষ্ট কি এত বেশী, খাবার পরবার কষ্ট কি এত বেশী, যা যাবে তার শতগুণ পাবে। এই অত্যাচার নিপীড়িত ভারতবর্ষে এই জীবননিষ্পেষণকারী আমলাতন্ত্রের অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ কর। সৈন্য নিয়ে এসে প্রহার করা তোমার গায়ের জোর। আমি হাত সরিয়ে নিয়ে আসব, তোমাদের কিছু করে তোমাদের সাহায্য করব না, তোমাদের কোন কাজ করব না—

এতো আমার অধিকার। আমি ওকালতি করব না এ কি এতই কঠিন? এতদিন তোমরা সবের নেতা হয়ে, সকলকে হাতে ধরে টেনে তুলেছিলে। কি বলবে দেশ; আজ কি বলবে পৃথিবী এই civilized world যারা এতদিন agitation করছিল এখন যখন স্বার্থের বলিদান আবশ্যক হল আর তাদের পাওয়া গেল না। ভাবতেও লজ্জা হয়, চোখে জল আসে, এই শ্রীহট্টে কি এমন উকীল নাই যারা ক্ষুদ্রস্বার্থ বলিদান দিতে ইচ্ছুক? প্রত্যেক শিরায় শিরায় বিধাতার বাণীর স্বার্থকতা আমাকে জানিয়ে যায়— তোমরা যদি না পার, সরে যাও। আমার দেশের ঐ চাষা মুটে মজুর তাদের বুকে ধরে আমি স্বরাজের পথে চলব। বক্তৃতা চাই না, কার্য্য চাই। এইটুকু ভাই কি দিতে পারবে না? দেশ ডাকছে। শৃঙ্খলাবদ্ধ তোমার মা ডাকিতেছেন। ভারতবর্ষ চিরকাল ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষিত। আর তোমরা এতটুকু ত্যাগ করতে পারবে না? এইটুকু স্বার্থ কি এত বেশী হলো? বিধাতার বাণী কি বিফল হবে, স্বরাজের চেয়ে কি তোমাদের ক্ষুদ্র স্বার্থ বড়? প্রাণখুলে দেখাতে পারলে দেখাতে পারতাম আজ কি আঘাত তোমরা দিলে।

এস ভাই উন্মুক্ত আকাশের নীচে, এস চাষার সঙ্গে যাদের ঘৃণা করতাম তাদের সঙ্গে। বাংলা ত্যাগমন্ত্রে এক হউক। জগতে দেখাই ভারতে ত্যাগেরই জয়, ভোগের জয় কখনো নয়। দলে দলে ছেলে বেরোও; দেশে দেশে যাও। গ্রামে গ্রামে কংগ্রেস সমিতি খুলুক। চরকার কাজে লাগ।

চরকার পুনরুত্থানে স্বরাজ প্রতিষ্ঠা হবে। এই যে নরবিগ্রহ সব আমার সামনে দেখতে পাই, তোমরা বিধাতার সম্মান অটুট রাখ, প্রত্যেক কাজে। এসেছি আমি ভিক্ষা করতে—ভিক্ষা দাও। শুধু অর্থের ভিক্ষা নয়—প্রাণের ভিক্ষা প্রাণ নিতে এসেছি, প্রাণ চাই। প্রাণের স্রোতে দেশ ভেসে যাক! কি দিবে ভাই আমার, তোমার ঐ ক্ষুদ্র স্বার্থ বলি দাও। এসো স্বরাজের জয়ধ্বনি হউক স্বরাজের জয় পতাকা ভারতে উড্ডীয়মান হউক।